

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কঙ্কগডের কঙ্কাল



কুন্ড ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্নখনি আমার সাগরে আছে। যে বইগুলো আমার শব্দস্বপ্ন এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, যেগুলো মনুস করে ছায়া বা কড়া পূরবেগুলো বা এড়িয়ে করে মনুস করে নেবে। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, যেগুলো কালে করে উপহার নেবে। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। প্রবুট ব্যক্তির পাঠ্যের সাথে এই পড়ার আভ্যাস ধরে রাখা। আমার অসীম বইয়ের সাইট স্ট্রিফল্ডের অতিরিক্ত ধন্যবাদ আমোদিত হানের এই আমি পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাবি কিছু অসিমাশ প্রাইম ও পি. ব্যাচন কে - যাঁরা আমাকে এডিট করা দালা করে দিখিয়েছেন। আমারই আর একটি প্রকাশ পুরানো নিম্নত পত্রিকা মনুস করে ডিজিটাইজ করা। অসিমাশ দেখতে পাবেন www.dholethola.blogspot.in সাইটে।

অপমানের সাথে যদি এমন কোন বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - (যোগাযোগ করুন -

ashutosh19@gmail.com

PDF এই কপিই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লাগে থাকে, এবং করতে চান যদি পাওয়া যায় - তাহলে বই চান মনুস মূল বইটি সাগর করতে অনুগ্রহ রাই। হার্ড কপি হতে বেওয়ার মজা, পুঁজি আবার মনি। PDF করার উদ্দেশ্য বিলা যে কোন বই সরবর এবং পুর পুঁজির মনুস পাঠ্যের সাথে বেইবে মেওয়া। মূল বই জিনুস। দেখক এবং প্রকাশনের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SHUBHAGIT KUNDU



কুন্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

ভালো বইয়ের স্বর্ণখনি আমার পাঠাগার আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইচ্ছামতো ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, যেগুলো মূল্য কম ছাত্র বা কলে পুনর্ব্যবহার বা এডিট করে মূল্য কম দেবে। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, যেগুলো ছাত্র করে উশ্বাস দেবে। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই পড়ার পাঠকের কাছে বই পড়ার আভাস ধরে রাখা। আমার মতনী বইয়ের সাইট স্টিকার্ডদের অতিরিক্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি পেরিয়ে করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ককু অস্টিনাস গ্রাইস ও পি. ব্যাচেলর কে - যারা আমাকে এডিট করা বাবা ভাবে বিধিয়েছেন। আমারই আর একটি প্রয়াস পুনর্ব্যবহার বিমুক্ত পত্রিকা মূল্য কম করে বিক্রি দেওয়া। অতিরিক্ত দেখতে গিয়েন www.dholokhola.blogspot.in বাইটটি।

অপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhasitkundu@gmail.com

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিক্রয় মতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লাগে থাকে, এবং ব্যক্তিগত হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে মত ছাত্র মূল মূল্য দিই সাংগে ছাত্রের অনুদান দিবে। হার্ড কপি মতে কেওয়ার মজা, পুঁজিও অসম্ভব মনি। PDF করার উদ্দেশ্য বিক্রয় যে কোন বই সংরক্ষণ এবং মূল মূল্যের সকল ব্যয়ভার কমে বেঁচে দেওয়া। মূল বই কিনুন। সেখান থেকে প্রকাশকের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHASIT KUNDU



কুন্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

ভালো বইয়ের স্বপ্নখি আমার পাগ্রে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, যেগুলো নতুন করে ছ্যান না করে গুননোঠকো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেখো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো ছ্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে এই পড়ার আভ্যাস ধরে রাখা। আমার স্ত্রী বইয়ের সাইট দুটিকর্তৃমূহের অগ্রিম ধন্যবাদ জানানি যাদের এই আমি পেয়েছি করব। ধন্যবাদ জানানি ককু অন্টিমাস গ্রাইম ও পি. ব্যাডম কে - যারা আমাকে এডিট করা কামা ভাবে পিথিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রকাশ সুযোগে বিম্মত পত্রিকা নতুন ভাবে তিরিখে আনা। অস্তিত্ব দেখতে পাবেন www.dholokhola.blogspot.in বাইটটি।

অপনাদের কাম যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে প্রজ্ঞ তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhasmita@gmail.com

PDF এই কামই নূন বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি অবশ্যই ভালো বেটা থাকে, এক ব্যক্তির হর্ত কলি পাওয়া যায় - তামলে বহু চত মন নূন বইটি সঃগ্রহ করার অনুমোদন গাইব। হর্ত কলি হতে কেওয়ার মজা, সুবিধে অমরা মনি। PDF করার উদ্দেশ্য বিজ্ঞ যে কোল এই সরসকণ এক। নূন পূজার সকল পাঠকের কামে বেঁচে দেওয়া। নূন বই তিনুন। লেখক এক প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHASMITA KUNDU



কুন্ড ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

হালা বইয়ের স্বর্নখনি আমার কাগরে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইচ্ছামতো ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, সেগুলো নতুন করে ছ্যান না করে পুনরোচ্চলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেখো। সেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো ছ্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। প্রকৃষ্ট স্বতন্ত্র পাঠকের কাছে বই পড়ার আভাস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি পেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ককু অন্টিন্যাস গ্রাইস ও পি. ব্যাডেন কে - যাঁরা আমাকে এডিট করা জালা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রদাস পুরোদো বিমুক্ত শত্রিকা নতুন ভাবে ডিরিয়ে আনা। অগ্রণীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhola.blogspot.in সাইটে।

অপন্যদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এক ভা শেষর করতে চান - যোগাযোগ করুন -

sushajit19@gmail.com

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকর হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনর ভালো বেলে থাকে, এক ব্যায়ে হার্ট কপি পাওয়া যায় - ভারলে নত প্রত নতুন মূল বইটি দাগর করার অনুগ্রাথ য়ে। হার্ট কপি হতে নেওয়ার মজা, দুবিয়ে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য ছিল যে কোন বই ফরগল এক দূর দূরন্তর সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এক প্রকাশনদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU



কুন্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, সেগুলো নকল করে স্ক্যান বা করে পুনরোগ্রহণ বা এডিট করে নকল ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার আনন্দে ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অন্টিমাস প্রাইম ও সি. ব্যান্ডন কে - যারা আমাকে এডিট করা সাহায্য করে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুর্বোক্ত পত্রিকা নকল ভাবে ছিড়িয়ে আনা। অগ্রণীরা দেখতে পাবেন www.dhulekhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিক্রয় হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - ভালো মত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে জানেন। PDF করার উদ্দেশ্য বিতরণ যে কোন বই সংগ্রহ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

COBRAJIT KONDU



কুন্ড ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুনরোগ্রহণ বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার আভ্যাস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অন্টিমাস প্রাইম ও সি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা লাগা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। অগ্রণীরা দেখতে পাবেন www.dhulekhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU



কুন্ড ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অস্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHAJIT KONDO



কুন্ড ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

ভালা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার পাঠে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, সেগুলো মনু কলে ছ্যান না কলে গুনোহকো বা এডিট করে মনু ভাবে যেনো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো ছ্যান করে উশহার যেনো। আমার উশ্বেশ্য ব্যবসায়িত ময়। শুই বইয়ের পাঠকের কাছে বই পড়ার আন্তাস ধরে রাখা। আমার স্বার্থী বইয়ের স্বাধিট সৃষ্টিকর্তার অশ্রিৎ ধনাবাদ আশাশি হানের বই আমি পেরার করব। ধনাবাদ আশাশি ককু অশ্রিৎমাস গ্রাইস ও বি. ব্যাডস কে - নারো আমাকে এডিট করা বাবা ভাবে পিখিয়েযেবা। আমাদের অর একটি প্রকাশ গুনোহো বিশ্বিত পত্রিকা মনু ভাবে ভিরিড়ে আনা। অশ্রিৎমা দেখতে গাবেন www.dhulokhela.blogspot.in নাইটটি।

অপনার কান যদি এমন কোনো বইয়ের কপি ছাত এক তা পেরার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhagatkundu@gmail.com

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিক্রয় মতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লাগে থাকে, এক ব্যক্তরে হার্ট করি পাওয়া যায় - ভালাে বই ছাত মনু মূল বইটি মঃগ্রহ করার অনুগ্রহ রাইল। হার্ট করি হাত কেওয়ার মঃগ্রহ, সুবিধে অবগার মানি। PDF করার উশ্বেশ্য বিরা যে কোল বই সংরকণ এবং মূল মূহুরের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই ডিনুনা। লেখক এক প্রকাশকর উশ্বেশিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHAGAT KUNDU



কঙ্কগড়ের কঙ্কাল

কঙ্কগাডের কঙ্কাল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—ইন্দ্রনীল ঘোষ
মুদ্রণ—রাজা প্রিন্টার্স

মিষ্ট ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ নিরালা প্রেস, ৪ কৈলাস মদুখার্জি
লেন, কলিকাতা ৬ হইতে ধীরেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত

ককগড়ের ককাল

কল্লি মড়ের

কল্লি



কর্নেল নীলান্দি সরকার খুব মন দিয়ে কী একটা বই পড়াছিলেন। ছেঁড়াখোঁড়া মলাট। পোকায় কাটাঁ হলে পাতা। নিশ্চয় কোনও পুস্তকো দৃষ্টান্ত বই। কিন্তু শেষ মার্চের এই সুন্দর সকালবেলাটা গভীর মন্থে বই পড়ে নষ্ট করার মানে হয়? দাঁতে কামড়ানো চুরুট কখন নিভে গেছে এবং সাদা দাঁড়িতে ছাইয়ের টুকরো আটকে আছে। একটু কেসে-গুঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। ধ্যান ভাঙল না। আমার উলটো দিকে সোফায় বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদার-মশাই উসখুস করছিলেন। একটিপ নিস্য নাকে গুঁজে আনমনে বললেন, “যাই গিয়া!”

এতক্ষণে কর্নেল বই বন্ধ করে বলে উঠলেন, “হালদারমশাই কি প্রেতাখ্য বিশ্বাস করেন?”

হালদারমশাইয়ের দুই চোখ গুলি-গুলি হয়ে উঠল। জোরে মাথা নেড়ে বললেন, নাহ্। “ক্যান?”

কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। “জয়ন্ত তুমি?”

“নাহ্।”

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি একবার জেরলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, “সমস্যা হল, আমাকেও কেউ এই প্রশ্ন করলে আমিও সোজা নাহ্ বলে দিতাম। কিন্তু অসংখ্য মানুষ প্রেতাখ্য বিশ্বাস করে। তাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি। কাজেই তারা এই বিশ্বাসের বশে এমন সাম্প্রতিক-সাম্প্রতিক সব কাণ্ড করে বসে কহতব্য নয়।”

হালদারমশাই উত্তেজিত ভাবে বললেন, “কেডা কী করল?”

কর্নেল হাসলেন। “করল নয়, করেছিল। ভেবে দেখুন হালদারমশাই। ১০৮টা নরবালি।”

“কন কী। পদলিশ তারে ধরে নাই?”

“পদলিশ এ-রহস্য ভেদ করতে পারেনি। যিনি পেরেছিলেন, তিনিই এই বইটা লিখে গেছেন।” কর্নেল বইটার পাতা খুলে দেখালেন। “তান্ত্রিক আদিনাথের জীবন এবং সাধনা। নামটা আমার পছন্দ। লেখকের নাম হরনাথ শাস্ত্রী। প্রায় নব্বই বছর আগে লেখা এবং ছাপা বই। আদিনাথ ছিলেন হরনাথের জ্যেষ্ঠমশাই।”

বললাম, “ওই তান্ত্রিক ভদ্রলোক ১০৮টা নরবালি দিয়েছিলেন?”

“তা-ই তো লিখেছেন হরনাথ। তান্ত্রিক ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল, ওই ১০৮টি প্রেতাখ্য তাঁর চেলা হবে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। একদিন ভোরবেলা

স্বয়ং তান্দ্রিককেই মন্দিরের হাড়িকাঠের কাছে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। মন্ডুহীন খড়। রক্তে-রক্তে ছয়লাপ! নিজেই বলি হয়ে গেলেন।”

হালদারমশাইয়ের গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছিল। বললেন, “মন্ডু গেল কই?”

কর্নেল হেলান দিয়ে চোখ বন্ধে বললেন, “মন্ডু পাওয়া যায়নি। অগত্যা খড়টা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হরনাথ লিখেছেন, দেড় মন ঘি আর আট মন কাঠের আগুনেও তান্দ্রিকের খড় একটুও পোড়েনি। শেষে লোক-জানাজানি এবং পদুলিশের ভয়ে মন্ডুকাটা খড়ে পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অশুভ ব্যাপার, পরদিন খড়টা জলে ভেসে ওঠে। নদীতে স্রোত ছিল। অথচ খড়টা দিবিয় স্মির ভাসছে।

বললান, “হরনাথবাবু দেখেছিলেন এসব ঘটনা?”

“তখন ঔঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। কাজেই স্মৃতি থেকে লেখা। কিন্তু তারপর উনি বা লিখেছেন, তা আরও অশুভ। বছর কুড়ি পরে হরনাথবাবু নাকি স্বপ্নে তান্দ্রিক জ্যাঠামশাইকে দেখতে পান। তান্দ্রিক ভদ্রলোক ভাইপোকে বলেন, ‘কেউ যদি আমার মন্ডুটা ধড়ের সঙ্গে জোড়া দেয়, আমি আবার সশরীরে ফিরে আসব।’”

“ততদিনে দুটোই তো কঙ্কাল। নিছক হাড় আর খুলি।”

হালদারমশাই দায় দিয়ে বলেন, “হঃ! স্কেলিটন অ্যান্ড স্কেল!”

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। “কিন্তু খুলি কোথায় পোঁতা আছে হরনাথবাবু? জানতেন না। কেউই জানত না। উনি কবন্ধ মড়াটা এনে সিন্দূকে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর খুলির খোঁজে হলো হিচ্ছিলেন। হঠাৎ আবার একদিন আদিনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে একটা মজার ধাঁধা বললেন। ওতেই নাকি খুলির সূত্র লুকনো আছে।

“আটঘাট বাঁধা

বার পনেরো চাঁদা

বুড়ো শিবের শুলে

আমার মাথা ছুঁলে

ওঁ হুঁং ক্লীং ফট্

কে ছাড়াবে জট II”

অবাক হয়ে বললান, “আপনার মন্থস্থ হয়ে গেছে দেখছি!”

কর্নেল হাসলেন। “সহজে মন্থস্থ হবে বলেই তো আগের দিনের লোকেরা ছড়া বাঁধত। মাস্টারমশাইরা অনেক ফরমুলা ছড়ার আকারে ছাত্রদের শেখাতেন।”

হালদারমশাই উৎসাহে নাথা নেড়ে বললেন, “হঃ। একথান শিখাছিলামঃ

“ইফ বার্দ ইজ হয়

বাট কিন্তু নট নয়...

গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ঠুকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম, “তা এই উদ্ভট বই নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ কী কর্নেল?”

কর্নেল গভীর হয়ে দাঁড়ির ছাই ঝাড়লেন। তারপর অভ্যাসমতো চওড়া টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, “হরনাথ এই ধাঁধার জট ছাড়াতে পারেন নি। ঠুঁর বংশধররাও পারেননি। কিন্তু সম্প্রতি যা সব ঘটছে বা ঘটেছে, তা থেকে এলাকার লোকদের বিশ্বাস জন্মেছে, তান্ত্রিক আদিনাথের সশরীরে পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমত, সিঁদুকের কঙ্কালটি কে বা কারা চুরি করেছে। দ্বিতীয়ত, দেবী চাঁড়কার শোড়ো মন্দিরের সামনে পর-পর দুটো নরবলি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, রামদু ধোপা সন্ধ্যার মৃৎখেলি বিল থেকে কাপড়ের বোঁচকা গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। সব চাঁদের আলো ফুটেছে, একটা কঙ্কাল ওর সামনে দাঁড়িয়ে হুঁকার দিয়ে বলেন, ‘আমি সেই আদিনাথ।’ রামদু গোঁ গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।”

হালদারমশাই বলে উঠলেন, “তারপর? তারপর?”

“রামদু এখন পাগল হয়ে গেছে। কীসব অশুভ কথাবার্তা বলছে। অবশ্য মাঝে-মাঝে ওর আচরণ কিছুকণ সন্মত মানুষের মতো।” কর্নেল বইটা ভ্রমারে ঢুকিয়ে বললেন, “গাধাটাও পাগল হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরা দেয় না।”

হালদার মশাই বললেন, “বাট হোয়ার ইজ দ্যাট প্লেস কর্নেলসার?”

“কঙ্কগড়। আপনি কি যেতে চান সেখানে?”

“নাহ্। এমনি জিগাই।” গোয়েন্দা ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মৃৎখে হাসলেন।

“কিন্তু কঙ্কগড় নামটা চেনা চেনা লাগছে। কঙ্কগড়...কঙ্কগড়...”

কর্নেল বললেন, “কঙ্কগড় বর্ধমান-বিহার সীমান্তে। দুর্গাপুর থেকেও যাওয়া যায়।”

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে একটিপ নসি়া নিলেন। “ছড়াটা কী কইলেন ব্যান কর্নেলসার?”

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটুকরো কাগজে ছড়াটা লিখে ঠুঁকে দিলেন। মৃৎখে দৃষ্টি-দৃষ্টি হাসি। হালদারমশাই ছড়াটা মৃৎখস্থ করার চেষ্টায় ছিলেন। আমাদের চোখে-চোখে কৌতুক লক্ষ্য করলেন না।

ষষ্ঠীচরণ আর এক প্রস্ত কফি আনল। কফির পেয়ালা তুলে বললাম, “হালদারমশাই! বোকা যাচ্ছে এই রহস্যের কেস কর্নেল নিজের হাতে নিয়েছেন। আপনি বরং ঠুঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারেন।”

হালদারমশাই বার্তিত দৃধমেশানো ঠুঁর স্পেশাল কফিতে চুমুক দিয়ে থি-থি

করে হেসে উঠলেন। ঠুঁর এই হাসিটি একেবারে শিশুসদৃশ। কে বলবে উনি একসময় দাঁদে পদ্মলিখ ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং ঠুঁর দাপটে যত দাগি অপরাধী ততশ্রু হয়ে থাকত? চাকরি থেকে অবসর নিয়ে প্রায় ডিটেক্টিভ এজেন্সি খুলেছেন। মাঝে-মাঝে কর্নেলের কাছে আড্ডা দিতে, আবার কখনও কোনও কেস পেলে ঠুঁর ভাষায় ‘কর্নেলসারের লগে কনসাল্ট করতেনও আসেন।

বললাম, “হাসছেন কেন হালদারমশাই?”

হালদারমশাই আরও হেসে বললেন, “কর্নেলসার কইলেন গাথাটা পাগল হইয়া গেছে। গাথা...খি খি খি...গাথা ইজ গাথা। অ্যাস! দুইখান এস্।”

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল মূর্চকি হেসে বললেন, “সম্ভবত দুইখান এস এলেন। নাহ্। অ্যাস নয়। শশিনাথ শাস্ত্রী।”

বললাম, “নাম শুনেন মনে হচ্ছে যজ্ঞমেনে বামন। পাণ্ডাপন্নরুতঠাকুর সম্ভবত। নাকি সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই?”

কিন্তু ষষ্ঠীচরণ সাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার বয়সী একজন যুবক। স্মার্ট, বকঝকে চেহারা। পরনে জিনস্, ব্যাগি শার্ট, কাঁধে ঝোলানো কিট্‌ব্যাগ। কর্নেলকেও একটু অবাক দেখাচ্ছিল। বললেন, “এসো দিপন্। তোমার বাবা এলেন না যে?”

যুবকটি বসে কব্‌জি তুলে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, “মিনিংয়ে হঠাৎ ট্রান্সকল এল। একটা মিসহ্যাপ হয়েছে বাড়িতে। বাবা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে চলে গেলেন। নটা পাঁচে একটা ট্রেন আছে।”

“কী মিসহ্যাপ?”

“আবার কী? একটা ডেডবার্ডি। ভজুয়া নামে আমাদের একজন কাজের লোক ছিল। মন্দিরের সামনে তার বর্ডি পাওয়া গেছে আজ ভোরে। একই অবস্থায়।”

হালদারমশাই নড়ে বসেছিলেন। ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, “নরবলি?”

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, “তোমার সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিই দিপন্। হালদারমশাই! এর নাম দীপক ভট্টাচার্য। হরনাথবাবুর কথা আপনাদের বলোছি। তাঁর পোত্র। দিপন্, ইনি প্রাইভেট ডিটেক্টিভ কে. কে. হালদার। আর—জয়ন্ত চৌধুরী। ‘দৈনিক সত্যসেবক’ পত্রিকার রিপোর্টার।”

দীপক আমাদের নমস্কার করল। তারপর হালদারমশাইকে বলল, “আপনি প্রাইভেট ডিটেক্টিভ?”

হালদারমশাই খুশিমুখে বললেন, “ইয়েস।”

কর্নেল বললেন, “দিপন্। বরং এক কাজ করো। তুমি হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি যথাসময়ে পৌঁছব।”

দীপক বলল, “দুপন্‌র সাড়ে বারোটায় একটা ট্রেন আছে। বাবা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।”

“চিন্তার কিছু নেই। আমি যাব’খন। আর শোনা, আমার থাকার ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে না।”

“সে কী! বাবা আমাকে—”

“নাহ্। আমি সরাসরি তোমাদের ওখানে উঠলে আমার কাজের অসুবিধে হবে। তুমি বরং হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে উনি যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এটা যেন কাউকে বোলো না।”

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, “আমারে মামা কইবেন।”

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। “দিপদূরা রাডের ঘটি। ওর মামা পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বললে লোকের সন্দেহ হবে। আপনি তো দিবি স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কথা বলতে পারেন।”

“তা পারি।” বলে হালদারমশাই আর একটিপ নসি নিলেন।

বললাম, “আসলে উত্তেজনার সময় হালদারমশাইয়ের মাতৃভাষা এসে যায়।”

কর্নেল বললেন, “তা যা-ই বলো জয়ন্ত, পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ওজন আছে। উত্তেজনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা একেবারে অচল। তাই দ্যাখো না, উত্তেজনার সময় যাঁরা পূর্ববঙ্গীয় ভাষা জানেন না, তাঁরা হিন্দি বা ইংরেজি বলেন।”

হালদারমশাই সটান উঠে দাঁড়ালেন। “ইউ আর হানড্রেড পারসেন্ট কারেঙ্ক কর্নেলসার!” বলে পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দীপককে দিলেন। “আমি হাওড়া স্টেশনে এনকোয়ারির সামনে ওয়েট করব। চিন্তা করবেন না।”

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পা বাড়িয়েছেন, কর্নেল বললেন, “একটা কথা হালদার-মশাই। আপনার একটা ছদ্মনাম দরকার।”

“হঃ।” বলে হালদারমশাই সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

ষষ্ঠীচরণ দীপকের জন্য কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে গেল। কর্নেল বললেন, “ভজ্জুয়ার বয়স কত? কতদিন তোমাদের বাড়িতে ছিল সে?”

দীপক বলল, “বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। ওরা পদ্রুদ্রবান্দুকমে আমাদের ফ্যামিলিতে ছিল। জমিদার ফ্যামিলিতে যেমন হয়। একগাদা লোকজন থাকে। অবশ্য এখন আর নেই। ভজ্জুয়া কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী লোক ছিল। ভূতপ্রেতের গল্প বলত বটে, বিশ্বাস করত বলে মনে হয় না। আমার ছেলেবেলায় ওর বউ মারা যায়। কিন্তু ও আর বিয়ে করেনি। আমার অবাঁক লাগছে, ওর মতো সাহসী আর বলবান লোককে কী করে বলি দিতে পারল?”

“তুমি কি প্রেতাশ্রয় বিশ্বাস করো?”

“নাহ্। ওসব শ্রেফ গুলতাপি। ঠাকুরদা কী সব বোণাস গল্প ফেঁদে গেছেন, আমি একটুও বিশ্বাস করি না। বাবাও বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু হঠাৎ দূ-দুটো নরবলির ঘটনা। তারপর পাতালঘর থেকে সিঁদুকের তালা

ভেঙে কে কঙ্কাল সরাল। তাই বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কর্নেল !
পাতালঘরের কথা আমি ঠাকুরমার কাছে শুনছিলাম। কিন্তু সিন্দুকে
যে কঙ্কাল আছে, তা আমি জানতাম না। নরবলির ঘটনার পর একরায়ে
বাবা আমাকে আর ভজ্জুয়াকে ডেকে চুপিচুপি পাতালঘরে ঢুকলেন। পাতাল-
ঘরের দরজার তালা কিন্তু ভাঙা ছিল না। গতকাল সন্ধ্যায় বাবা আপনার
কাছে সব কথা খুলে বলেননি।”

“হয়তো কঙ্কগড়ে গেলে বলবেন ভেবেছিলেন।

দীপক চাপা গলায় বলল, “সিন্দুকের ভিতর কঙ্কাল সত্যিই ছিল কি ?
আমার বিশ্বাস হয় না। অতকালের পুরনো কঙ্কাল। আস্ত থাকার কথা
নয়। অথচ সিন্দুকে একটুকরো হাড়ও পড়ে নেই।”

“ভজ্জুয়াকে কেউ ওভাবে খুন করবে কেন ? তোমার কী ধারণা ?”

দীপক একটু চুপ করে থাকার পর বলল, “সম্ভবত ভজ্জুয়া কিছ্‌ জানত।
তার মানে, শচীনদা আর জগাইকে কে বা কারা ওভাবে খুন করেছে, সে
জানতে পেরেছিল। কারণ জগাই খুন হওয়ার পর ভজ্জুয়া আমাকে বলেছিল,
খামোকা একজন সাধুসন্ন্যাসী মানুষের বদনাম রটাচ্ছে লোকে। তাঁর আত্মা
স্বর্গে বাস করছেন ভগবানের কাছে। ভজ্জুয়া বলেছিল, শিগগির সে এর
বিহিত করবে।”

“ভজ্জুয়া বলেছিল ?”

“হ্যাঁ। দাদুর জ্যাঠামশাই সম্পর্কে ভজ্জুয়ার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তার
ঠাকুরদার বাবা নাকি গুঁর সেবা করত।” দীপক হঠাৎ একটু নড়ে বসল।
“মনে পড়ে গেল ! গত মাসে দোতলা থেকে অনেক রাতে আমি কিলের ধারে
জঙ্গলের ভেতর আলো দেখেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমি তো আসানসোলে
পড়াশোনা করেছি। কঙ্কগড়ে সবসময় থাকিনি। তো সকালে মাকে কথাটা
বললাম। মা বললেন, ওই জঙ্গলে আলো নতুন কিছ্‌ নয়। মা-ও নাকি
অনেকবার দেখেছেন। আমি কিন্তু এতকাল পরে ওই একবার।”

বললাম, “কিসের আলো ? মানে—টর্চ না হারিকেন ?”

“না। মশালের আলো বলে মনে হয়েছিল।”

কর্নেল চোখে হেসে বললেন, “প্রেতাত্মারা টর্চ বা হারিকেন জ্বালে না
জ্বলত !”

দীপক বলল, “আপনি কি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন ?”

“প্রকৃতিতে রহস্যের শেষ নেই দিপু !”

দীপক যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল ! বলল, “আমি চাঁল তা হলে।”

“আচ্ছা, এসো।”

দীপক বেরিয়ে গেলে বললাম, “কঙ্কগড়ের সাংঘাতিক ভূতটা আপনাকে

পেয়ে বসেছে মনে হচ্ছে। ভূত বা প্রেতাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির কী সম্পর্ক?”

কর্নেল গম্বীর মুখে বললেন, “আছে। প্রকৃতি চির-আদিম। ভূতপ্রেতও আদিম শক্তি, ডালিং!”

॥ ২ ॥

কঙ্কগড়ে আমরা উঠেছিলাম সরকারি ডাকবাংলোয়। বাংলোটি পুরনো ব্রিটিশ আমলে তৈরি। গড়নে বিলিতি খাঁচ। কিন্তু অযত্নের ছাপ আঙুঠপুঠে লেগে আছে। লনের ফুলবাগান আর চারপাশের দেশি-বিদেশি গাছপালা একেবারে জঙ্গলে হয়ে গেছে। চৌকিদার রঘুলাল দুঃখ করে বলাছিল, নতুন সার্কিট হাউস হওয়ার পর সরকারি কর্তারা এলেন সেখানেই ওঠেন। সেখানে জায়গা না পেলে তবে কদাচিৎ কেউ এখানে জোটেন। আসলে বসতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলেই এই দুর্ভাবস্থা।

তবে নীচেই সেই বিশাল ঝিল এবং পাশেই জঙ্গলের শব্দ। তার ওধারে একটা নদী আছে। তার মানে, একসময় ঝিলটি নদীর অববাহিকার একটা স্বাভাবিক জলা ছিল। ইদানীং অনেকে একে ‘লেক’ বলতে শব্দ করেছেন। খনি অঞ্চলের শিল্পনগরী থেকে দল বেঁধে অনেকে পিকনিক করতেও আসে। রঘুলাল বলাছিল, নরবালির পর পিকনিক বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অনেক আগে এদিকটা জনহীন হয়ে পড়ে। রঘুলালও সন্ধ্যাস্তের আগে বাড়ি চলে যায়। তবে ‘কর্নেলসার’ যখন এসেছেন, তখন রাত্তিরটা এখানে কাটাতে তার ভয় নেই। এই সারেরকে সে ভালই চেনে। এর আগে কতবার উনি এখানে এসেছেন।

আমরা পৌঁছেছিলাম বিকেল চারটে নাগাদ। আমাকে বিশ্রাম করতে বলে কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। বাংলোর বারান্দা থেকে লক্ষ করছিলাম, উনি বাইনোকুলারে পাখি-টাকি দেখতে-দেখতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেলেন। রঘুলাল একটা থামে হেলান দিয়ে বসে কঙ্কগড়ের গল্প করছিল। তান্ত্রিক আদিনাথের অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথাও বলাছিল। আদিনাথের কঙ্কালের খড় ও মন্ডের কাহিনীও তার জানা। খড় ও মন্ড জোড়া লাগলে তান্ত্রিক আদিনাথ যে সশরীরে আবার আবির্ভূত হবেন, এটা সে বিশ্বাসও করে এবং তার ধারণা, এই কাজটা কেউ করতে পেরেছে এতদিনে। তাই তান্ত্রিকবাবা নিজের কাজে নেমে পড়েছেন।

বললাম, “কিন্তু তান্ত্রিকবাবা তো শুনছি ১০৮টা নরবালি দিয়ে সিঙ্কিলাভ করেছিলেন। আবার কেন উনি নরবালি দিচ্ছেন?”

রঘুলাল বাংলা বলতে পারে বাঙালির মতোই। মাথা নেড়ে বলল, “না সার! ১০৮টা নরবালির আগে উনি নিজেই বালি দিয়েছিলেন। শুনছি,

তিনটে নরবালি বাকি ছিল। এতদিনে হয়ে গেল।”

“এই লোক তিনটিকে তুমি চিনতে?”

“চিনব না কেন সার? প্রথমে বলি হলেন শচীনবাবু। উনি ম্যাজিক দেখাতেন।”

“ম্যাজিশিয়ান ছিলেন?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন। তো তারপর গেল জগাই। জগাই শ্মশানে মড়া পোড়াত। শেষে গেল ভজ্জুয়া। জমিদারবাড়ির কাজের লোক। জমিদারি আমাদের ছোটবেলায় উঠে গেছে। তা হলেও জমিদারবাড়ি নামটা টিকে আছে। খুব বড় বাড়ি সার! অনেক ভেঙেচুরে খণ্ডহর হয়ে পড়ে আছে। তবে দেখলে বোঝা যায় কী অবস্থা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বদ্বন্দ্বন, তান্ত্রিকবাবা ছিলেন ওই জমিদারবাড়ির লোক। শুনিয়েছি, বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে জপতপ নিয়েই পড়ে থাকতেন।”

এরপর রঘুলাল রামু ধোপা আর তার গাধার গম্পে চলে এল। একঘেয়ে উত্তর গম্প শোনার চেয়ে ঝিলের ধারে কিছুক্ষণ বেড়ানো ভাল। লনে নামলে রঘুলাল চাপা গলায় সাবধান করে দিল, “আঁধার হওয়ার আগেই চলে আসবেন সার! কর্নেলসারের কথা আলাদা। উনি মিলিটারির লোক।”

গেট পেরিয়ে ধাপবান্দি পাথরের সিঁড়ি। ফাটলে ঝোপ আর আগাছা গজিয়ে আছে। নীচের রাস্তা এবড়োখেবড়ো। রাস্তাটা এসেছে বাঁ দিক থেকে এবং এখানেই তার শেষ। ডান দিকে ছোট-বড় নানা গড়নের পাথর এবং ঝোপঝাড়, গাছপালা। সামনে একফালি পায়েরলা পথ নেমে গেছে ঝিলের ধারে। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা ভাঙাচোরা পাথরে ঘাট। ঝিলের জলটা স্বচ্ছ। সূর্য পেছনে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে। তাই ঝিলে ছায়া পড়েছে। সামনে-দূরে ধূসর কুয়াশা। একটা পানকৌড়ি আপনমনে ডুবসাঁতার খেলছে। একটু দূরে থামের আড়ালে কোথাও জলপিপির ডাক শোনা গেল পি-পি-পি!

ঘাটের মাথায় বসে ছিলাম। কর্নেলের সংসর্গে মাথার ভেতর হয়তো প্রকৃতিপ্রেম ঢুকে গেছে। দিনশেষের এই ধূসর সময়টা সত্যি অনুভব করার মতো। জলমাকড়সার অবিস্বাস্য গতিতে ছোটছোট, জলজ ফুলের ওপর টুকটুকে প্রজাপতি ও গাঙফড়িংয়ের ওড়াউড়ি, পাখিপাখালির ডাক। সব মিলিয়ে জীবজগতের একটা আশ্চর্য স্পন্দন।

হঠাৎ পাশেই খুঁট করে একটা শব্দ। চমকে উঠে দেখি, এক টুকরো ঢিল সদ্য গড়িয়ে পড়ছে। বুকটা খড়াস করে উঠল। বটপট উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তন্নতন্ন খুঁজলাম। কাউকেও দেখতে পেলাম না। ঢিলটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। গাড়ার দিয়ে ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ বাঁধা আছে। কাঁপা-

কাঁপা হাতে কঁড়িয়ে নিলাম। কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখি ডটপেনের লাল কালিতে লেখা আছে।

ও

ওহে টিকটিকির চেলা! কাল সকালেই কঙ্কগড় ছেড়ে না গেলে মা চণ্ডীকার পায়ে বলি হয়ে যাবে! বড়ো টিকটিকিকে জানিয়ে দিয়ো!

আজ রাতে প্রেতাত্মা পাঠিয়ে আগাম সঙ্কেত দেব। সাবধান!

হাতের লেখা আঁকাবাঁকা, খুদে হরফ। খুব ব্যস্তভাবে লেখা। চিরকুটটা পকেটে ভরে আবার কিছুদ্ধক্ষণ চারপাশে খুঁটিয়ে দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। ঝিলের পশ্চিম পাড় এটা। উত্ত-পূর্ব কোণে কঙ্কগড় বসতি এলাকা শূন্য। প্যাস্টের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে এদিকে ওদিকে নজর রেখে বাংলোর নীচে পৌঁছলাম। গা ছমছম করছিল অজানা ত্রাসে। লোকটা কি আড়াল থেকে নজর রেখেছে? আবার কিছুদ্ধক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রিভলভার পকেটে ঢুকিয়ে দ্রুত বাংলায় উঠে গেলাম। রঘুলাল আমাকে দেখে সদুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বলিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে উত্তম মধুে বলল, “আপনি কি কিছুদ্ধ দেখে ভয় পেয়েছেন সার?”

রুদ্ধক্ষ মেজাজে বললাম, “নাহ্। কেন?”

রঘুলাল বিনীতস্বরে বলল, “আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে।”

“কিছুদ্ধই দেখাচ্ছে না। তুমি শিগগির এক কাপ চা করো।”

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। সহাস্যে বললেন, “রামদুর্গা গাথাটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডার্লিং! গাথাটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। ওকে বুদ্ধি দিয়ে বললাম, দ্যাখো বাপদু, এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়! গাথাবলির বিধান শাস্ত্রে আছে বলে শুনিনি। তবে বলা যায় না।”

আন্তে বললাম, “ব্যাপারটা রসিকতা করার মতো নয়। রীতিমত বিপজ্জনক। এই দেখুন।”

কর্নেল চিঠিটা পড়ে নিয়ে বললেন, “কোথায় পেলে?”

ঘণ্টাটা বললাম। শোনার পর কর্নেল একটু ব্যাজার মধুে বললেন, “লোকটা আমাকে টিকটিকি বলেছে, এটাই আমার সঙ্গে যথেষ্ট অপমানজনক। তুমি তো জানো জয়ন্ত, টিকটিকি কথাটা এসেছে ডিটেকটিভ থেকে। আমি লোকদের বোঝাতে পারি না, আমি ডিটেকটিভ নই এবং কথাটা আদতে গালাগাল।”

“আজ রাতে ভুত পাঠাবে বলে শাসিয়েছেও।”

“তা একটা কেন, একশোটা পাঠাক। কিন্তু টিকটিকি...ছি!” বলে কর্নেল হাঁকলেন, “রঘুলাল!”

রঘুলাল কিচেন থেকে ট্রেতে কফির পট, পেয়ালার সাজিয়ে এনে টেবিলে

রাখল। সেলাম দিয়ে বলল, “কর্নেলসাবকে আসতে দেখেই আমি কফি বানাতে গিয়েছিলাম।”

কর্নেল চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বললেন, “খবর পেয়েছি, আজ রাতে এ-বাংলোয় ভূত এসে হানা দেবে। তৈরি থেকে রঘুদালাল।”

রঘুদালাল কাঁচুমাচু হাসল। “কর্নেলসাব থাকতে ভূতপেরেত ডাকবাংলোর কাছ ঘেঁষতে সাহস পাবে না। কিন্তু সার, একটু আগে আমার মেয়ে দুলারি এসেছিল। বলল, ওর মায়ের খুব জ্বর। আমি ওকে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে বললাম। তো...”

কর্নেল হাত তুলে বললেন, “না, না! তুমি বাড়ি চলে যেয়ো। রাতের খাবারটা বরং এখনই তৈরি করে রাখো। আমরা খেয়ে নেবখন।”

রঘুদালাল হতদন্ত কিচেনের দিকে চলে গেল। বললাম, “রঘুদালাল আসলে কেটে পড়তে চাইছে। ওর মেয়ের এসে মায়ের জ্বরের খবর দেওয়াটা শ্রেফ মিথ্যা।”

“কেন বলো তো?”

“ওর মেয়ে এলে টের পেতাম।”

“তুমি কিছড়ই টের পাও না, জয়ন্ত!” কর্নেল হাসলেন। তারপর টেবিলে রাখা বাইনোকুলারটি দেখিয়ে বললেন, “এই যন্ত্রচোখ দিয়ে ফুকপরা একটি বাচ্চা মেয়েকে বাংলোর লনে আমি দেখেছি। অবশ্য তোমাকে দেখতে পাইনি। কারণ বাংলাটা উঁচুতে। তুমি নীচে ঝিলের ধারে ছিলে। ওখানে বথেষ্ট ঝোপঝাড়। তবে তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তান্ত্রিক হরনাথের প্রেতাঙ্গা ধারালো খাঁড়া হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

কর্নেল কফি শেষ করে ঘরে ঢুকলেন। সত্যি বলতে কি, একা বারান্দায় বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, কর্নেল টেবিলবাতির আলোয় একগোছা অর্কিড খুঁটিয়ে দেখছেন। বোঝা গেল, জঙ্গলে কোথাও সংগ্রহ করেছেন। আমাকে সেই অর্কিডটার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে শুনান করতে বললাম, “ওসব পরে শুনব। রঘুদালালের কাছে কিছড় তথ্য জোগাড় করেছি। অর্কিডের চেয়ে সেগুনলো দামি।”

“কী তথ্য?”

“শচীনবাবু ছিলেন ম্যাজিশিয়ান। আর জগাই ছিল মশানের...।”

“হুঁ, ম্যাজিশিয়ানদের বলা হয় জাদুকর। জাদুর সঙ্গে নাকি তন্ত্রমন্ত্রের সম্পর্ক আছে। আবার তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তান্ত্রিক এবং তান্ত্রিকের সঙ্গে মশানের সম্পর্ক আছে। কাজেই তোমার তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শাস্ত্রীমশাই, মানে দিপদ্র বাবার কাছে সে-খবর কলকাতায় বসেই পেয়ে গেছি।”

চাপা গলায় বললাম, “যাই বলুন, এই রঘুদালাল লোকটিকে আমার পছন্দ

হচ্ছে না। খুব খুঁত! আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া ঝিলের ঘাট থেকে বাংলোয় ফেরার সময় কী করে ও টের পেল আমি সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছি? বলল, আপনি কি ভয় পেয়েছেন? আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে...।”

“তোমাকে এখনও কেমন যেন দেখাচ্ছে, ডার্লিং!” কর্নেল মৃদুচকি হেসে বললেন। “ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না যারা, ভূতপ্রেতের ভয় তাদেরই বেশি। বিশেষ করে ভূতের চিঠি ভূতের চেয়ে সাংঘাতিক।”

চটে গিয়ে বললাম, “ভূতপ্রেত হুমকি দিয়ে চিঠিটা লেখেন। লিখেছে কোনও মানদুষ।”

“হুঁ, মানদুষ। সেই মানদুষকে সম্ভবত তান্মিক আদিনাথের ভূত ভর করেছে।”

রসিকতা শোনার মেজাজ ছিল না। তবে বরাবর এটা লক্ষ্য করেছি, রহস্য যত জটিল এবং সাংঘাতিক হয়, আমার বুদ্ধ বস্তুটিকে রসিকতা তত বেশি ভূতের মতো ভয় করে। বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছাড়িয়ে দিলাম। ট্রেন আর বাসজার্নির ধকল এতক্ষণে পেয়ে বসেছিল। একটু পরে লক্ষ করলাম, কর্নেল পকেট থেকে একটুকরো ভাঙা চাকতির মতো কী একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেন। তারপর কিতাব্যাগ থেকে খুঁদে একটা ব্রাশ আর লোশনের শিশিও বেরোতে দেখলাম। চাকতিটার আধখানা চাঁদের মতো গড়ন। লোশনে ব্রাশ চুবিয়ে ঘষতে থাকলেন কর্নেল! জিজ্ঞেস করলাম, “জঙ্গলে মোহর কুড়িয়ে পেয়েছেন বুঝি?”

কর্নেল আনমনে বললেন, “মোহরের ভাঙা টুকরো বলতেও পারো! তবে সোনার নয়। সেকলে মৃদুও নয়। কী সব খোদাইকরা সিলের টুকরো। কাদা ধুয়ে ফেলেও কিছুর বুঝতে পারিনি। দেখা যাক।”

কিছুক্ষণ পরে রঘুলালের সাড়া পাওয়া গেল। ওর হাতে টর্চ আর লাঠি দেখলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, “সব রেডি রইল সার! কিচেনঘরের চাবিটা দিয়ে যাচ্ছি। আমি ভোর ছটায় এসে যাব।”

কর্নেলের ইশারায় ওর হাত থেকে কিচেনের চাবি নিয়ে এলাম। ও চলে গেল। কর্নেল ভাঙা সিলটা আতশ কাচে দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলাম, “গদুপ্তবৃগের সিল নাকি?”

“কী? গদুপ্তবৃগ?” কর্নেল নিম্নম সম্ভারাতের পদরনো ডাকবাংলোর স্তম্ভতা ভাঙুর করে অট্টহাসি হাসলেন। “হুঁ, ওই এক পদুরাত্তিক বাতিক জয়ন্ত! মাটির তলায় কিছুর পাওয়া গেলেই সটান গদুপ্তবৃগ। তার আগে বা পরে নয়! তবে এটাই আশ্চর্য! এটা পদুরো একটা সিলের আধখানা মাত্র। সিলটা আধখানা কেন, এটাই প্রশ্ন।”

এই সময় আচমকা বাংলোর আলো নিভে গেল। কর্নেল তখনই টর্চ জ্বেলেন, “ফায়ারপ্রেসের ওপর থেকে হারিকেনটা এনে জ্বেলেন দাও জয়ন্ত ! লোডশেডিং প্রেতাঙ্কাকে বাংলায় আসার সুযোগ করে দিতে পারে। কুইক !” তাঁর কণ্ঠস্বরে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক। কিন্তু আমার গা ছমছম করতে লাগল।

ইংরেজ আমলের বাংলা। কাজেই ফায়ারপ্রেস আছে। ষাটপট হারিকেন জ্বেলেন এনে টেবিলে রাখলাম। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম। কর্নেল বললেন, “চলো ! বরং বারান্দায় বসে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতিদর্শন করা যাক।”

বেরিয়ে গিয়ে দেখি সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। বিলের জল ঝিলমিল করছে। গাছপালা তোলপাড় করে বাতাস বইছে। সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি আবার ফিরে এল। ভয়ের চোখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলাম। হাতে টর্চ এবং পকেটে রিভলবার তৈরি। আশ্বে বললাম, “সত্যি লোডশেডিং, নাকি কেউ মেইন সুইচ অফ করেছে দেখে আসা উচিত। কারণ ওই তো দূরে আলো দেখা যাচ্ছে।”

কর্নেল বললেন, “ছেড়ে দাও ! জ্যোৎস্নায় পদ্রনো পৃথিবীকে ফিরে পাওয়া যায়। তাছাড়া জ্যোৎস্নার একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও আছে। কোন কবি যেন লিখেছিলেন, “এমন চাঁদের আলো / মরি যদি সে-ও ভাল / সে মরণ স্বরণ-সমান।”

বিরক্ত হয়ে বললাম, “মৃত্যুটা প্রেতাঙ্কার হাতে হওয়া বস্তু অপমানজনক। আমরা মানদুষ।”

“ভালিং ! তা হলে দেখছি এই আদিম পরিবেশ তোমাকে প্রেতাঙ্কায় বিশ্বাসী করতে পেরেছে।”

“বোগাস ! আসলে আমি বলতে চাইছি...”

“বলার আগে দেখে নাও। ওই দ্যাখো, ডান দিকে ঝোপের আড়ালে প্রেতাঙ্কা উঁকি দিচ্ছে !”

ভাবাচাকা খেয়ে সেইদিকে টর্চের আলো ফেললাম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বোধবুদ্ধি হারিয়ে গেল। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালের মাথায় উঁচু ঝোপজঙ্গল। একখানে ঝোপ থেকে মধুখ বের করে আছে সত্যিই একটা কংকাল। খুঁলি থেকে কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ টেবিলে রেখে রিভলবার বের করে ছুঁড়লাম। কর্নেল আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন। “জয়ন্ত ! জয়ন্ত ! করছ কী ?”

এবার টর্চ জ্বেলেন দেখি কংকাল অদৃশ্য। উত্তেজিতভাবে বললাম, “অবিশ্বাস্য ! অসম্ভব !”

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, “সব ভেস্তে দিলে তুমি ! আমাদের কাছে ফায়ার আর্মস আছে জ্বেনে গেল প্রেতাঙ্কাটা। এবার ও খুব সাবধান

হয়ে যাবে।”

বলে কর্নেল টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে যোগটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ চারদিকে আলো ফেলে তন্নতন খুঁজে ফিরে এলেন। একটু হেসে বললেন, “যা ভেবেছি তা-ই। একটা কথা বলি, ডার্লিং! এখানে কোথাও যা কিছু ঘটুক, কখনও মাথা খারাপ করে ফেলবে না। বিশেষ করে গুলি ছোঁড়াটা চলবে না।”

চটে গিয়ে বললাম, “বলি দিলেও চুপচাপ থাকব?”

“তোমাকে বলি দিয়ে ওর লাভ হবে না।”

“আপনাকে যদি চোখের সামনে বলি দেয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখব?”

কর্নেল বারান্দায় বসে চুরট জেরলে বললেন, “আমাকে বলি দেওয়ার সাহস ওর হবে না। কারণ আমার মনে হচ্ছে, ও আমাকে ভালই চেনে। কংগড়ে আনি তো এই প্রথম আসছি না।”

হেঁয়ালি করা কর্নেলের এক বিরক্তিকর অভ্যাস। তাই চুপ করে গেলাম। একটু পরে নীচের দিকে মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা গেল! আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল। গেটের নীচের রাস্তায় এসে মোটরসাইকেলটা থামল। তারপর টর্চের আলোয় দীপককে আসতে দেখলাম।

তার হাতেও টর্চ ছিল। বারান্দায় এসে বলল, “আলো নেই কেন কর্নেল? সার্কিট হাউসে আলো দেখে এলাম। ওখানে আলো থাকলে এখানেও থাকার কথা।”

“সম্ভবত প্রেতান্না নেইন সুইচ অফ করে দিয়ে গেছে।” কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন। “দিক না। জ্যোৎস্না আজকাল দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বাই হোক, আমরা এখানে উঠেছি কী করে জানলে?”

দীপক হাসল। “কিছুক্ষণ আগে রামু পাগলা—মানে সেই রামু বাবার কাছে গিয়েছিল। বিকেলে ঝিলের জঙ্গলে ওর গাধার খোঁজে গিয়ে নাকি আড়াল থেকে দেখেছে, এক দাড়িওয়ালা সায়েব-ভূত ওর গাধার সঙ্গে কথা বলছেন। দেখেই সে পালিয়ে এসেছে। আপনি তো শুনছেন, বাবার কোবরেজি বাতিক আছে। রামুকে রোজ সাংঘাতিক-সাংঘাতিক কী সব পাচন গোলাচ্ছেন। রামু লক্ষ্মীছেলের মতো রোজ তিনবেলা বাবার কাছে পাচন গিলতে যায়। তো বাবা আমাকে খোঁজ নিতে বললেন, আপনি এই ডাকবাংলোয় উঠেছেন কি না। কারণ এই বাংলাটা ঝিল আর জঙ্গলের কাছেই।”

“আমাদের হালদারমশাইয়ের খবর কী?”

“ওঁকে নিয়ে প্রবলেম। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। গতকালও তা-ই। রাত দুপুরে ফিরেছিলেন। আজ কখন ফেরেন কে জানে?”

“কতদূর এগোলেন, কিছন্ন বলেছেন তোমাকে ?”

“ঠাকদুর্দার জ্যাঠামশাইয়ের খুঁলি কোথায় পৌঁতা ছিল, সেই জায়গাটা নাকি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আপাতত আমাকে জায়গাটা দেখাতে চান না। স্বথাসময়ে দেখাবেন। দ্যাটস্ মাচ।” দীপক উঠে দাঁড়াল। “মেইন স্‌ইচটা দেখে আসি। এভাবে বসে থাকার মানে হয় না!”

“থাক দিপদু! পরে আলো জ্বালা হবে। তুমি গিয়ে দ্যাখো, হালদারমশাই ফিরলেন কিনা। ঠুঁর জন্য একটু চিন্তা হচ্ছে। গোয়েন্দা হিসাবে পাকা। পদুনিশের প্রাক্তন দারোগা। দ্দুদুস্তি সাহসী। তবে বড় হঠকারী মানদুষ। আর শোনো, আমার সঙ্গে প্রক্যুশ্যে যোগ্যযোগ করো না। দরকার হলে আমিই করব। বাবাকে বোলো, আমরা খাসা আছি। প্রেতাঝা-দর্শনেরও সৌভাগ্য হয়েছে।”

দীপক চমকে উঠল, “মাই গুডনেস! প্রেতাঝা মানে?”

“ভূত। দিপদু, তুমি এখনই কেটে পড়ো।”

দীপক হেসে ফেলল। তারপর, “ঠিক আছে, চলি।” বলে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

কিচেনের পাশে মেইন স্‌ইচ সত্যি নামানো ছিল। আমার সন্দেহ রঘুলালই কাজটা করেছে। কিন্তু কর্নেল তা মানতে রাজি নন। রঘুলাল তাঁর ঢেনা লোক। অমন বিশ্বাসী লোক নাকি তিনি জীবনে দেখেননি। দুর্লভ প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজে বহুবার কক্ষগড়ে এসেছেন। রঘুলাল তাঁর সেবায়ত্নের ঝুটি করেনি। তাঁর সঙ্গী হয়েছে ঘুরেছে।

ওবে লোকটি পাকা রাঁধুনি, স্বীকার না করে পারলাম না। খাওয়ার পর বারান্দায় কিছুদ্ধুগণ গম্পসগম্প করে যখন শূয়ে পড়লাম, তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। আমার ঘুম আসছিল না। কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। জানালার দিকে তাকাতে আমার ভয় করছে। এই বদুঁঝ তান্ত্রিক আদিনাথের কক্ষাল এসে উঁকি দেবে!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চাপা স্বরে বললেন, “উঠে পড়ো ডার্লিং! শিগগির!”

বড়মড় করে উঠে বসে বললাম “সকাল হয়ে গেল নাকি?”

“নাহ্। রাত দেড়টা বাজে! এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। ওঠো, ওঠো!”

“কোথায়?”

“বাইরে গিয়ে দ্যাখো। তা হলেই বুঝতে পারবে।”

দরজা কর্নেলই খুলে রেখেছেন। বাংলোর লনে আলো পড়েছে! তার

ওখানে আদিম প্রকৃতি। ঝিলের দক্ষিণে জঙ্গলের ভেতর একটা আলো চোখে পড়ল। আলোটা নড়াচড়া করছে। বললাম, “দীপক এই আলোর কথাই বলিছিল তা হলে!”

কর্নেল বললেন, “হ্যাঁ সেই আলো। ঝটপট রেডি হয়ে নাও। টর্চ, ফায়ার আর্মস সঙ্গে নেবে। কিন্তু সাবধান! আলো জ্বালবে না বা মাথা খারাপ করে গুলি ছুঁড়বে না।”

কর্নেল তৈরী হয়েই ছিলেন। আমি তৈরী হয়ে বেরোলে দরজায় তালা এঁটে দিলেন। তারপর দু’জনে গেট পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে রাস্তায় নামলাম। এবার কর্নেল, আগে, আমি পেছনে। বনবাদাড় ভেঙে কর্নেল হাঁটছেন। আমি ওকে অনুসরণ করে চলছি। জ্যেৎস্নার জন্য জঙ্গলের ভেতরটা মোটামুটি স্পষ্ট। কোথাও চকরাবকরা, কোথাও ঘন ছায়া। শনশন করে বাতাস বইছে। কর্নেল যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, বদ্বতে পারলাম, এই জঙ্গলের অশ্বিসন্ধি ঠাঁর পরিচিত। সেই আলোটা কখনো-কখনো আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। আলোটা জ্বলছে ঝিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে আমরা যেখানে পেঁছলাম, সেখানে একটা ধ্বংসস্থল। কর্নেল গর্দাঁড় মেরে দুটো জঙ্গল-ঢাকা স্তুপের মাঝখান দিয়ে এগোলেন। ফিসফিস করে বললেন, “চূপচাপ এসো। টুঁ শব্দটি নয়।”

খানিকটা এগিয়ে একটা উঁচু প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় গেলাম দু’জনে। প্রকাণ্ড সব ঝড়ির নেমেছে বটগাছটার। একটা ঝড়ির আড়ালে কর্নেল বসে পড়লেন। আমিও বসলাম। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই একটা মশাল মাটিতে পোঁতা আছে। দাউদাউ জ্বলছে।

আর মশালের পাশে দাঁড়িয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গি করছে সেই নরককালটা। মশালের পেছনে একটা পাথুরে দেওয়াল। দেওয়ালে কংকালটার ছায়াও নড়ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন, এ এমন একটা দৃশ্য।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কংকালের দু’হাতের মূঠোয় একটা চকচকে খাঁড়া। একটু তফাতে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা আছে। তার পাশে একটা লোক আট্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কংকালটা খাঁড়া নাচিয়ে খ্যানথেনে গলায় বলে উঠল, “এখনও বলছি ওটা কোথায় আছে বল। না বললেই বলি হয়ে যাবি।

বন্দি লোকটা গোঁ-গোঁ করে কী বলার চেষ্টা করল। পারল না।

কংকালটা হৃৎকার দিল। “ন্যাকামি হচ্ছে? তুই আমার খুঁলির সমাধি খুঁড়েছিস। তুই, তুই ওটা পেয়েছিস। দে বলছি!”

বন্দি লোকটা আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। তখন কংকালটা এক পা বাড়িয়ে খাঁড়া তুলে তেমনই খ্যানথেনে গলায় বলে উঠল, “তবে মর!”

এর পর আমার মাথার ঠিক রইল না। কর্নেলের নিষেধ ভুলে গেলাম।

চোখের সামনে নরবলি হবে ! আস্ত একটা ভূত মানুষের গলায় কোপ বসাবে ! এ সহ্য করা যায় ? একলাফে বেরিয়ে গিয়ে রিভলবার তুলে গর্জে উঠলাম, “নির্কুচি করেছে ব্যাটাচ্ছেলে ভুতের !”

অমনই কংকালটা শূন্যে ভেসে পেছনের পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল । তাড়া করতে যাচ্ছি, কর্নেল ডাকলেন, “জয়ন্ত ! জয়ন্ত ! কী পাগলামি করছ ?” খাপ্পা হয়ে বললাম, “পাগলামি আমি করছি না আপনি ? চোখের সামনে একটা মানুষকে একটা ভূত ব্যাটাচ্ছেলে বলি দেবে...”

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন । “প্রেতাশ্বার পেছনে তাড়া করে লাভ নেই, ডার্লিং ! বরং এসো হালদারমশাইয়ের বাঁধন খুলে দিই ।”

আকাশ থেকে পড়ে বললাম, “উনি হালদারমশাই ? কী সর্বনাশ !”

কর্নেল মশালটা উপড়ে এনে বন্দি হালদারমশাইয়ের কাছে পড়তলেন । মশালটা তৈরী করা হয়েছে একটা ত্রিশূলে । টর্চের আলোয় গোয়েন্দা ভদ্রলোকের দূর্দশা দেখে কষ্ট হল । দড়ির বাঁধন খুলে দেওয়ার পর উনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন । থি-থি করে একচোট হেসে বললেন, “বলি দিত না । ভয় দ্যাখাইতাছিল ।”

কর্নেল টর্চের আলো জ্বেললে সেই ভাঙা দেওয়ালের কাছে কিছু তদন্ত করতে গেলেন । আমি বললাম, “হালদারমশাই ! কংকালটার হাতে খাঁড়া ছিল । সে সত্যি আপনার গলায় কোপ বসাতে যাচ্ছিল ।”

“কী ? কংকাল ? হালদারমশাই পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন । “কই কংকাল ? কোথায় কংকাল ? কোথায় দেখলেন ?”

গোয়েন্দা ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, “নাহ্ । একজন সাধুবাবা । কাপালিক কইতে পারেন । তারে ফলো করে আসছিলাম । হঠাৎ সে গাছের উপর থেকে জাম্প দিল । ওঃ ! কী সাংঘাতিক জোর তার গায়ে মশাই !”

“কিন্তু আমরা দেখলাম একটা কংকাল খাঁড়া হাতে আপনাকে শাসাচ্ছে ।”

“ভুল দ্যাখছেন !” বলে হালদারমশাই প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকালেন । আবার একচোট হেসে বললেন, “আমার ফায়ার আর্মস আছে টের পাই নাই ।”

“তা হলে কোন কংকাল আপনি দেখেননি ?”

“নাহ্ ।”

“কিন্তু সে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল । শাসাচ্ছিল ।”

“কাপালিক ! কাপালিক !”

কর্নেল এসে বললেন, “কংকালটাকে হালদারমশাই দেখতে পাননি । কারণ ঠুকে ওপাশে কাত করে ফেলে রেখেছিল । উনি ভাবছিলেন, যে-কাপালিক ঠুকে ধরেছে, সে-ই কথা বলছে ।”

হালদারমশাই নস্যর কোটো বের করে নস্য নিলেন। তারপর বললেন, “কর্নেল সার! জয়ন্তাবদ কংকালের কথা বলছেন। কিছু বদ্বতে পারতাহি না। আপনি বদ্বাইয়া দেন, এখানে স্কেলিটন আইল ক্যামনে?”

“পরে বদ্বিয়ে দেব। এদিকটায় ঝিলের একটা ঘাট আছে। চলুন ঝিলের জলে, ঘাড়ে আর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেবেন। ব্রেন বরবরে হয়ে যাবে।”

কর্নেল মশালটা মাটিতে ঘষটে নেভালেন। তারপর ধনসন্তুপের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানেও একটা ভাঙাচোরা পাথরে ঘাট। হালদারমশাই রগড়ে হাত-মুখ ধুলেন। কাঁধে জলের ঝাপটা দিলেন। তারপর বললেন, “ওই যাঃ! হোয়্যার আর মাই শব্দজ? অ্যান্ড মাই টর্চ?”

কর্নেল হাসলেন। “দেখলেন তো? জল আপনার ব্রেন কেমন চাঙ্গা করে দিয়েছে।”

হালদারমশাইয়ের জুতো দুটো ওপাশে একটি ভাঙা মন্দিরের তলায় অনেক খোঁজার পর পাওয়া গেল। কিন্তু টর্চটা পাওয়া গেল না। এদিকটায় একসময় দালানকোঠা ছিল বোঝা যাচ্ছে। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, “হ্যাঁ। এখানেই কংকগড়ের রাজধানী ছিল। এখন জঙ্গল। মৃদল আমলের একটা গড়ও ছিল। সেটা এই জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখন একটা টিবিবাত্র। যাই হোক, আর এখানে নয়। বাংলায় ফেরা যাক।”

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, “টর্চটা গেল। কাপালিকেরই কাজ।”

কর্নেল বললেন, “কাপালিক আপনার টর্চ কুড়নোর সময় পারিনি। কাল সকালে এসে বরং ভাল করে খুঁজবেন।”

আমরা কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ পেছন থেকে একঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। তারপর দীপকের সাড়া পেলাম। “কর্নেল! আমি দিপদু।”

হালদারমশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন, “এসো ভাগনে! এসো, মামা ভাগনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।”

দীপক প্রায় দৌড়ে এল। উত্তেজিতভাবে বলল, “জঙ্গলে আলো দেখতে পেরেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা বিকট হাসি শুনলাম। টর্চ জেরলে দেখি...”

কর্নেল বলে উঠলেন, “কংকাল?”

“হ্যাঁ! আস্ত কংকাল।” দীপকের হাতে একটা বল্লম দেখা গেল। সেটা তুলে সে বলল, “বল্লমটা তাক করতেই কংকালটা ভ্যানিশ! নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছি না কর্নেল! তবে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কী করা উচিত ভাবছি, সেই সময় ঝিলের ঘাটে টর্চের আলো চোখে পড়ল। আপনাদের কথাবার্তা শুনতে পেলাম। আলোটা দেখেই কি আপনারাও এখানে এসেছিলেন?”

“হ্যাঁ।” কর্নেল বললেন। “এবং আমরাও কংকালটাকে দেখেছি।”
হালদারমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, “আমি দেখি নাই। আমি একজন কাপালিক দেখেছি। তারে ফলো করছিলাম।”

দীপক বলল, “কাপালিক! বলেন কী মমাবাবু?”

“হঃ! কাল রাত্রেও তারে ফলো করছিলাম। চন্ডীর মন্দিরের ওখানে ত্রিশূল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। আমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। আবার আজও বহুক্ষণ ওত পেতে থেকে তারে দেখলাম। আজ আর মাটি খুঁড়ছিল না। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা ছিল।” বলে হালদারমশাই কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। “বোঁচকাটা গেল কই?” বোঁচকা লইয়া দৌড়ানো সহজ নয়। বোঁচকায় কী থাকতে পারে বলুন তো কর্নেলসাব?”

কর্নেল বললেন, “কংকাল থাকতেও পারে।”

দীপক বলল, “তা হলে ওটা কি ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইয়ের সেই কংকাল?”

কর্নেল বললেন, “কিছু বলা যায় না! তবে আর এখানে নয়। বাংলায় ফেরা যাক। দিগ্ন তুমিও এসো। মামাবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরবে।”

দীপক পা বাড়িয়ে নার্ভাস হেসে বলল, “ঠাকুরদার লেখা বইটার কথা তা হলে সত্যি? কিন্তু কে ওই কাপালিক?”

আমি বললাম, “সে-যে-ই হোক, আপনাদের পাতালঘর থেকে সে কংকাল চুরি করেছে। এবং কোথায় খুলি পোতা ছিল তাও আবিষ্কার করেছে। তারপর ধড়ের সঙ্গে মন্ড জুড়েছে। প্রেতাশ্বাস বিশ্বাস করি বা না করি, এই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে।”

হালদারমশাই আনমনে বললেন, “আমি কংকাল দেখলাম না ক্যান?”

বললাম, “চোখে দেখেননি। তার বিদগ্ধটে কথাবার্তা কানে তো শুনছেন।”

“হঃ।” বলে গদম হয়ে গেলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক।

ডাকবাংলোয় আবার আলো নেই। তার চেয়ে অশুভ ব্যাপার, আমাদের ঘরের দরজার তালা ভাঙা। কিচেনের দিকে গিয়ে দেখি, মেন সুইচ আগের মতো অফ করা আছে। অন করে দিলাম। আলো জ্বলল উঠল। ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, লণ্ডভণ্ড অবস্থা। কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ গোছাচ্ছেন। হালদারমশাই বিভীষিকা করছেন, “চোর! চোর! কাপালিক না, চোর!”

দীপক আর আমি ওলটপালট বিছানা দুটো ঠিকঠাক করে ফেললাম। আমার ব্যাগের জিনিসপত্র মেঝেয় ছত্রখান হয়ে পড়ে ছিল। গুঁছিয়ে নিলাম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, “চোর বস্তু বোকা। তার এটুকু বোঝা উচিত ছিল, যা সে খুঁজতে এসেছে, তা বাংলায় রেখে যাওয়ার পাত্র আমি নই। আসলে প্রথমে সে ধরেই নিয়েছিল জিনিসটা হালদারমশাইয়ের কাছে আছে। তাই তাঁকে বলিদানের ভয় দেখাচ্ছিল। আমরা গিয়ে পড়ার পর

সে পালিয়ে গেল। কিন্তু তার মাথায় তখন খটকা বেধেছে। বলিদানের হুমকিতেও যখন জিনিসটা পাওয়া গেল না তখন ওটা নিশ্চয় হালদারমশাইয়ের কাছে নেই। সম্ভবত আমার কাছেই আছে। অতএব আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সে বাংলায় এসে হানা দিয়েছিল।”

কর্নেল মেঝের দিকে তাকালেন। “খালি পায়ে এসেছিল চোর। লাল সূর্যকির স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। হুঁ, একটুখানি জলকাদা ভেঙেই—মানে শর্টকাটে এসেছিল সে। যাই হোক, রাত তিনটে বাজে প্রায়। জয়ন্ত, তুমি কিচেনে গিয়ে কেরোসিন কুকার জেরলে, প্রিজ, একপট কফি করে ফেলো! কফি! কফি এখন খুবই দরকার।

দীপক বলল, “চলুন জয়ন্তদা! আমি আপনাকে হেল্প করছি।”

রঘুলাল কাজের লোক। কিচেনে সব কিছু ঠিকঠাক রেখে গিয়েছিল। কফি তৈরির কাজটা আমিই করলাম। দীপক প্রহরীর মতো বল্লম আর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রইল। তার ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল, যে ভীষণ ভয় পেয়েছে। পাওয়ারই কথা। ভয় কি আমিও পাইনি? এই চমৎকে জ্যান্ত কঙ্কাল দর্শন আর তার বিকট খ্যানখেনে গলায় কথাবার্তা শোনা জীবনে একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। কর্নেল ঠিকই বলেন, ‘প্রকৃতির রহস্যের শেষ নেই। সভ্যতার আলোর তলায় আদিম রহস্যে ভরা অন্ধকার থেকে গেছে।’

কফি করতে করতে হালদারমশাইয়ের দূর্দশার বিবরণ দিলাম দীপকবাবুকে। দীপক হাসবার চেষ্টা করে বলল, “ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে।”

বললাম, “কর্নেলের মাথাতেও কম ছিট নেই।”

ট্রেতে কফির পট আর পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে এলাম। দীপক কিচেনে তালো এঁটে দিল। ঘরে ঢুকে দেখি হালদারমশাই চাপা গলায় কর্নেলকে তাঁর তদন্ত রিপোর্ট দিচ্ছেন।

কফি খেতে-খেতে ক্রমশ চাপা হচ্ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্যান্ট-শার্টে লালচে দাগড়া-দাগড়া ছোপ। খি-খি করে হেসে বললেন, “কর্নেলসার কইলেন, যে দড়ি দিয়া আমারে বাঁধাছিল, তা নাকি রামদু ধোপার গাধা বাঁধার দড়ি। ঠিক, ঠিক। তাই তো ভাবছিলাম, কাপালিক দড়ি পাইল কই?”

রামদু এবং তার গাধাকে নিয়ে কর্নেল হালদারমশাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ রসিকতার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, “নাহ্ দিপদু এবার শূন্যে পড়া উচিত। তোমার মামাবাবুর ওপর বন্ড থকল গেছে। ঠুঁর বিগ্রাম দরকার।”

“হঃ।” বলে হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে আমরা শূন্যে পড়লাম। কর্নেল বললেন, “তা হলে ডার্লিং, তোমাকে যা বলেছিলাম...”

ওঁর কথার ওপর বললাম, “হ্যাঁ। রহস্য ঘনীভূত। কিন্তু কঙ্কাল যে

জিনিসটা চাইছিল, সেটা কি ওই চাকতি ?”

“হ্যাঁ। ব্রোঞ্জের সিল।”

“কী আছে ওতে ?”

কর্নেল সেই ছড়াটা আওড়ালেন ঘুমঘুম কণ্ঠস্বরে :

আটঘাট বাঁধা

বার পনেরো চাঁদা

বুড়ো শিবের শূলে

আমার মাথা ছুঁলে

ওঁ হুঁং ক্লীং ফট্

কে ছাড়াবে জট ॥

তারপর ওঁর নাক-ডাকা শব্দ হল। কয়েকবার ডেকে আর সাড়া পাওয়া গেল না ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এমন সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার পর ঘুমনো যায় না। বারবার সেই দৃশ্যটা চোখে ভাসছিল। মশালের আলোয় ভাঙা দেওয়ালের ধারে একটা নরকংকাল। দৃ’হাতে চকচকে খাড়া ; তার ওই খ্যানখেনে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।

কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। তড়াক করে উঠে বসলাম। কর্নেলকে দেখতে পেলাম। মাথার টুপিতে শব্দকনো পাতা, মাকড়সার জাল, খড়কুটো আটকে আছে। হাতে প্রজাপতি ধরা নেট-স্টিক। গলায় ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার বুলছে। বললেন, “দশটা বাজে প্রায়। ব্রেকফাস্ট রেডি। রঘুলালকে বলে গিয়েছিলাম, তোমাকে যেন যথেষ্ট ঘুমোতে দেয়।”

উনি পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলেন। বদ্বলাম, যথারীতি ভোরবেলা প্রকৃতিজগতে চলে গিয়েছিলেন। তবে অনেক দৌঁর করেই ফিরেছেন আজ।

কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্টে বসে বললাম, “কক্ষালের ব্যাপারটা ঠিক বদ্বতে পারছি না। সত্যিই কি ওটা তান্দ্রিক আদিনাথের কংকাল ?” কর্নেল দ্যাড়ি থেকে একটা পোকা বের করে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, “কাল রাতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত। কিন্তু তোমার হঠকারিতার জন্যই সব ভেঙে গেল। তুমি যদি আমার কথা মেনে চুপচাপ থাকতে, আমাকে আর বেশি পরিশ্রম করতে হত না।”

“কী মদ্বশিকল ! ব্যাটাচ্ছেলে হালদারমশাইয়ের গলায় খাড়ার কোপ চালাতে যাচ্ছিল যে।” কর্নেল আনমনে বললেন, “যা হওয়ার হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে বেরনো যাক।”

“ওই ভুতুড়ে জঙ্গলে ?”

“নাহ্। মশানে।”

কংকাল দর্শনের পর শ্মশানযাত্রা। যদিও দিনদুপুর, ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। কর্নেলের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বনবাদাড় ভেঙে যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে একটা নদী। নামেই নদী। বালি আর পাথরে ঠাসা অগভীর একটা সোঁতা। এঁকেবেঁকে ঝিরঝিরে একফালি কালো জল অবশ্য বয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় জীর্ণ কংডেম্বর। নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে তিনটে কাচাবাচ্চা হুমুড়ি করে কী খেলা খেলছে।

কর্নেল কংডেম্বরের কাছে গেলেন। এতক্ষণে ওপাশে একটা বাঁশের মাচা দেখতে পেলাম। মাচার বসে আছে একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে। কটিপাথরে খোদাই করা চেহারা যেন। পরনে হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া লাল গেঞ্জি। আমাদের দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কর্নেল মিঠে গলায় বললেন, “কী মনাই? আমাকে চিনতে পারছ না? গত বছর তুমি আমাকে জঙ্গলের গাছ থেকে কত অর্কিড পেড়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ছে।”

মনাই নামে ছেলেটির মুখে একই হাসি ফুটল। মাচা থেকে নেমে সেলাম দিয়ে বলল, “নদীর ওপারে একটা গাছে দেখেছি সার! লাল-লাল পাতা।”

“তোমার বাবার খবর শুনেন মন খারাপ হয়ে গেছে মনাই!”

মনাইয়ের মুখের খুঁশি চলে গেল। চোখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। বড়লাম, মনাই সেই জগাইয়ের ছেলে। তার চোখ ছলছল করছিল।

কর্নেল বললেন, “তোমার মা কোথায়?”

মনাই আশ্তে বলল, “ঘাটোয়ারিবাবুর অফিসে গেছে। বাবার মাইনের টাকা ব্যাক আছে। বাবু রোজ ঘোরাচ্ছে মাকে।”

কর্নেল বাঁশের মাচায় সাবধানে বসলেন। পূরনো মাচা ঠাঁর ভার সহিতে পারবে না মনে হচ্ছিল। উনি ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। ভয়ে-ভয়ে একপাশে বসলাম। কর্নেল বললেন, “জগাইয়ের এটা আড্ডা দেওয়ার আখড়া ছিল জয়ন্ত! সন্ধ্যাবেলা ওর কাছে কত লোক আড্ডা দিতে আসত। তাই না মনাই?”

মনাই মাথা নাড়ল।

“মাঝে-মাঝে সাধুসন্ন্যাসীরাও এসে এখানে খুঁনি জরালিয়ে বসতেন শুনছি। জগাই বলছিল। তো তোমার বাবা খুন হওয়ার আগেও নিশ্চয় কোনও সাধুসন্ন্যাসী এসেছিলেন। ওই যে! খুঁনির ছাই দেখছি।”

মনাই একটু ইতস্তত করে বলল, “ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে এক সাধু আসত সার! চেহারা দেখলে ভয় করে। মাথায় জটা। লাল চোখ। মা বলছিল, ওই সাধুই

প্রথমে ম্যাজিকবাবুকে চ'ডীর থানে বলি দিয়েছে। তারপর বাবাকে।”

“ম্যাজিকবাবু মানে শচীন হাজরা?”

মনাই মাথা দোলাল। বলল, “মা বলছিল, ওই সাধুই অজ্ঞান করে বাবাকে বলি দিয়েছে। বাবাকে যে-রাতিরে বলি দেয়, খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি জেগেই ছিলাম। মা বারবার ঘরের দোর ফাঁক করে বাবাকে ডাকছিল। বাবা এল না। শেষে জলঝড় থামলে মা ল'ঠন হাতে এখানে এল। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে এল। বলল, দু'জনে ঠ্যাং ধরে টানতে-টানতে ঘরে ঢোকাব।”

কর্নেল চুরদুট জেরলে বললেন, “বলো কী! তারপর?”

“এসে দাঁখি বাবা নেই। সাধু বসে আছে। মা সাধুবাবাকে ডাকাডাকি করল। সাধুবাবা চোখ বুজে মত্তর পড়িছিল। তাকালই না। তখন মা সাধুবাবাকে বকাঝকা করল। অনেকক্ষণ পরে সাধুবাবা চোখ কটমট করে বলল, “জগাইকে একটা কাজে পাঠিয়েছি। তোরা ঘুমোগে যা।”

“তোমরা ঘুমোতে গেলে?”

মনাই ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে বলল, “হুঁ। তারপর আর বাবার পাস্তা নেই। সন্ধ্যাবেলা একটা মড়া এল। ঘাটোয়ারিবাবুর লোক এক পাজী কাঠ মাথায় করে এল। বাবা নেই দেখে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করল। সেই সময় রামু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে খবর দিল চ'ডীর থানে।”

মনাই ঢোক গিলে থেমে গেল। কর্নেল বললেন, “পদলিশ আসেনি তারপর?”

“এসেছিল সার! মা সব বলেছে পদলিশকে।”

“আচ্ছা মনাই, সেই সাধুবাবাকে আগে কখনও দেখেছ? ভাল করে ভেবে বলো।”

“দেখিনি। তবে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল।”

“ভজ্ঞানাকে নিশ্চয় চিনতে জুঁমি? সে-ও তো বলি হয়ে গেছে শুনোছি।”

“হ্যাঁ সার! মা বলছিল এ-ও সাধুবাবার কাজ। সাধুবাবা নাকি মানদুশ না। মানদুশের রূপ ধরে এসেছিল।”

কর্নেল গভীর মূখে মাথা দোলালেন। “ঠিক বলেছ মনাই! শুনোছি সাধুবাবা আসলে একটা নরকস্কাল।”

মনাই চমকে উঠল। ভয়-পাওয়া মূখে বলল, “সার! মা বলছিল, সাধুবাবার কাছে যেন একটা কংকাল দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দেখতে পাইনি। মা নাকি দেখেছিল।”

“সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে?”

মনাই জোরে মাথা দোলাল। কর্নেল ওর হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে টাকাটা নিয়ে পকেটে ঢোকাব। বলল, “চলুন সার! সেই

গাছ থেকে লাগপাতার হুরি পেড়ে দেব ।”

“ওবেলা আসব’খন । তো, ভজ্জয়া তোমার বাবার কাছে আস্তা দিতে আসত না ?”

“আসত । আসত সার !”

“সাধুবাবা থাকার সময় ভজ্জয়া এসেছিল ?”

“হুঁউ !”

কর্নেল উঠলেন । বললেন, “ওবেলা আসব । তখন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব । চলি !”

শ্মশানতলা থেকে একফালি পায়ের-চলা পথে পেঁঁছে বস্লাম, “ছেলেটা বেশ স্মার্ট । এবং অত্যন্ত সরল ।”

“প্রকৃতির মধ্যে যারা থাকে, তারা স্বভাবত সরল হয় । আর ওকে স্মার্ট বললে । সে-ও ঠিক । কারণ এখনই ওকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই দিতে হবে । সম্ভবত এই বয়সেই ঘাটোয়ারিবাবু ওকে কাজে বহাল করবেন । তবে মড়াপোড়ানো কাজটা ওর পক্ষে কঠিন হবে না । বাবার সঙ্গে এই কাজটা ওকে করতে হয়েছে । আমি দেখেছি ।”

“এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি ?”

“ম্যাজিকবাবুর বাড়ি ।”

কক্ষগড়ের এদিকটা চেহারায় একেবারে পাড়াগাঁ । গা ঘেঁষাঘেঁষি মাটির বাড়ি, টালি বা খড়ের চাল । কিন্তু কয়েকটা বাড়ির মাথায় টিভি-র অ্যান্টেনা দেখে অবাক হলাম । কিছুক্ষণ পরে একটা পিচের রাস্তায় উঠলাম । এর পর মফস্বল শহরের চেহারা । নতুন-পুরনো একতলা বা দোতলা বাড়ি । পিচ রাস্তায় ট্রাক, টেম্পো, জিপ, প্রাইভেট কার এবং সাইকেল রিকশার বিরক্তিকর আনাগোনা । মোড়ে একটা খালি সাইকেল রিকশার কাছে গেলেন কর্নেল । বললেন, “ওহে রিকশাওয়ালা, এখানে ম্যাজিকবাবুর বাড়িটা কোথায় জানো ?”

রিকশাওয়ালা চমকে-ওঠা ভঙ্গিতে বলল, “ম্যাজিকবাবু ? সে তো মা চ’ড়ীর খানে নরবলি হয়ে গেছে সার !”

“বলো কী !”

“আজ্ঞে হ্যাঁ । সে এক সাম্প্রতিক কাণ্ড । কথায় বলে, বেদের মরণ সাপের হাতে । যে ভূতটাকে নিয়ে খেলা দেখাত, সেই ভূতটাই নাকি বলি দিয়েছে !”

“ভূত নিয়ে খেলা দেখাত ম্যাজিকবাবু ? কেমন ভূত ? তুমি দেখেছিলে ভূতের খেলা ?”

রিকশাওয়ালা দর্শনাত্মক মূখে একটু হাসল । “দেখেছিলাম সার ! নরককাল ইন্সট্রেক্ট এসে নাচত । ম্যাজিকবাবু বলত, ওঠ । উঠে দাঁড়াত । বোস, বললে বসত । নাচ, বললে নাচত । সে কী নাচ সার !”

কর্নেল চুরট জেরলে বললেন, “ওর বাড়িটা কোথায় ? নিয়ে চলো আমাদের।”
রিকশাওয়ালা বলল, “ম্যাজিকবাবুর নিজের বাড়ি তো ছিল না সার !
বাউঁড়ুলে লোক । মাঝে-মাঝে এসে থাকত । আবার চলে যেত কোথায় ।”

“কিন্তু কার বাড়িতে এসে থাকত ?”

“মোহনবাবুর বাড়িতে । ইন্সকুলের মাস্টার উনি ।”

“চলো । মোহনবাবুর কাছে যাওয়া শাক ।” বলে কর্নেল রিকশায় উঠে
বসলেন । গুঁর ইশারায় আমিও উঠে বসলাম ।

রিকশাওয়ালা বলল, “কিন্তু মাস্টারমশাই তো এখন ইন্সকুলে আছেন ।”

“গুঁর বাড়ি গিয়ে খবর দেব’খন । তুমি গুঁর বাড়িতেই নিয়ে চলো ।”

“বাড়ি অবধি রিকশা যাবে না ।”

“যতদূর যায়, নিয়ে চলো ।”

রিকশাওয়ালা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে প্যাডেলে চাপ দিল । যেতে-যেতে বলল,
“মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাউকে পাবেন না । মিছিমিছি হুজুরান হবেন, সার !”
কর্নেল বললেন, “কেন ? বাড়িতে লোক নেই ?”

“নাহ্ । মাস্টারমশাই একা থাকেন । বিয়ে-টিয়ে করেননি । বিধবা দাঁদিকে
এনে রেখেছিলেন । তিনিও স্বগ্গে গেছেন ।”

“ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে নিশ্চয় কোনও সম্পর্ক ছিল মাস্টারমশাইয়ের ?”

“শুনছি, পিসতুতো না মাসতুতো ভাই গুঁরা !”

পিচরাশু ছেড়ে খোয়াঢাকা এবড়ো-খেবড়ো ঘিঞ্জি গলি-রাস্তায় এগোচ্ছিল
রিকশা । একসময় নিরিবিলি একটা জায়গায় পেঁছলাম । কাছাকাছি বাড়ি নেই ।
শুদ্ধ জরাজীর্ণ ছোট-ছোট মন্দির আর পোড়ো ভিটে । জঙ্গল গজিয়ে আছে
চারদিকে । সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে । একধারে রিকশা দাঁড় করিয়ে
রিকশাওয়ালা বলল, “আর যাওয়া যাবে না সার । এই যে পায়েচলা রাস্তা দেখছেন,
সিধে গিয়ে বাঁ দিকে তাকাবেন । মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি দেখতে পাবেন !”

আমরা নামলে সে রিকশা ঘুরিয়ে একটু হেসে বলল, “মাস্টারমশাইকে খবর
দেওয়ার লোক পাবেন কি ? দেখুন । বরঞ্চ আমাকে দড়ো টাকা বাড়তি দিলে
ইন্সকুলে খবর দেব । আপনাদের ফেরত নিয়েও যাব ।”

“কর্নেল ওকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, “দরকার নেই । আমি লোক
খুঁজে নেব ।”

রিকশাওয়ালা এতক্ষণে সন্দেহমুখে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে
রিকশার সিটে উঠল । তারপর কে জানে কেন, খুব জোরে রিকশা চালিয়ে চলে
গেল । কর্নেল অভ্যাসমতো বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, ‘এসো
জয়ন্ত । কুইক । আমার ধারণা, রিকশাওয়ালা মোহনবাবুকে হেঁচে পড়েই খবর
দেবে, দূ’জন উটকো লোক গুঁর বাড়িতে গেছেন ।’

পায়েরচলাপথে শূকনো পাতা পড়ে আছে। দূ'ধারে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা শিবমন্দির। ঘন ঝোপঝাড় আর উঁচু গাছপালা। পাখিদের তুমুল চ্যাচামেচি চলেছে। এলোমেলো জোরালো হাওয়া দিচ্ছে। বাঁ দিকে প্রায় হানাবাড়ির মতো দেখতে একটা একতলা বাড়ি দেখা গেল। সদর দরজায় তালা আঁটা। কর্নেল বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠুঁকে অনুসরণ করলাম। ওদিকটায় একটা হজামজা পুকুর দেখা গেল। কর্নেল আবার চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, “তুমি এই কোপের আড়াল থেকে ওই রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে তিনবার শিস দেবে। বোকামি কোরো না কিন্তু। সাবধান।”

বাড়িটার পেছনের পাঁচিল জায়গার-জায়গায় ধসে গেছে কবে। সেখানে ডালপালার বেড়া দেওয়া হয়েছে। একখানে বেড়া ঠেলে সরিয়ে কর্নেল ঢুকে গেলেন। বুক টিপটিপ করতে লাগল। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে বাগিয়ে ধরলাম এবং গর্দাঁড় মেরে বসলাম। রাস্তাটার দিকে নজর রাখলাম।

তারপর কর্নেলের আর পাত্তা নেই। বসে আছি তো আছিই। অস্বস্তি যত, বিরক্তিও তত। কতক্ষণ পরে পেছনে কোথাও শূকনো পাতার মচমচ শব্দ এল। দ্রুত পিছন ফিরে দেখি, পুকুরের দিকে নেমে যাচ্ছে একটা গাধা। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা। রামদুর্গ গাধাটা নয় তো?

গাধাটা অদৃশ্য হলে আবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে দেখি কর্নেল যা বলছিলেন, ঠিক তা-ই। সেই রিকশাটা এসে থামল। রিকশা থেকে রোগা চেহারার খুঁতিপাজ্জাব-পরা এক ভদ্রলোক হতভম্ব নামলেন। অমনই তিনবার শিস দিলাম।

এতক্ষণে কর্নেল বেড়া গলে বেরিয়ে এলেন। চাপা স্বরে বললেন, “কেটে পড়া থাক। চলে এসো।”

আমরা গর্দাঁড় মেরে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পুকুরের চারপাড়ে ঘন জঙ্গল। তলায় দামে ঢাকা খানিকটা জল। গাধাটা পিঠে বোঁচকা নিয়ে অশ্রুত ভঙ্গিতে জলজ ঘাস খাচ্ছে। কর্নেল গাধাটার দিকে প্রায় দৌড়ে গেলেন। ঠুঁর এই পাগলামি দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

উনি কাছে যেতেই গাধাটা এক লাফে পুকুরের ধারে-ধারে নড়বড় করে দৌড়তে থাকল। কর্নেল তাড়া করলেন। গাধাটা পাড়ের জঙ্গল ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেল।

এবং কর্নেলও।

অগত্যা আমাকে দৌড়তে হল। পাশের জঙ্গলে ঢুকছি, পেছন থেকে চেরা গলায় হাঁকডাক ভেসে এল, “চোর! চোর! ধর! ধর!”

একবার ধূরে দেখে নিলাম, সেই রিকশাওলা আর সম্ভবত মোহন মাস্টার-

মশাই দৌড়ে আসছেন। কেলেকারিতে পড়া গেল দেখছি। জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে দেখলাম কর্নেল বা গাধা নেই। হলুদ ফুলে ঢাকা সরষে আর সবুজ ধানখেত এদিকটায়। ডান দিকে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা মন্দির। লুকিয়ে পড়ার জন্য সেদিকটায় দৌড়ে গেলাম। পেছনের চ্যাচামেচি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

হাঁফাতে-হাঁফাতে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের আড়ালে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলাম। তারপরে দেখতে পেলাম কর্নেলকে। চোখে বাইনোকুলার রেখে একটা উঁচু গাছের ডগায় কিছন্ন দেখছেন। কাছে গিয়ে বললাম, “কী অদ্ভুত কান্ড আপনার।”

“ডার্লিং। আমার চেয়ে অদ্ভুত কান্ড করল রামদুর্ গাধাটা। রামদু পাগল হয়েছে। গাধাটার তো পাগল হওয়ার কথা নয়।”

বিরক্ত হয়ে বললাম, “আর একটু হলেই কেলেকারি হত। সেই রিকশাওলা আর মোহনবাবু আমার পেছনে চোর-চোর, ধর-ধর বলে তাড়া করেছিলেন।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, “তোমাকে দেখে ফেলেছিলেন নাকি?”

“হ্যাঁ।”

“সেটা তোমারই বোকামি। আমার পেছন-পেছন তোমারও দৌড়নো উচিত ছিল।” বলে কর্নেল চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন। “কুইক জয়ন্ত। আর এখানে নয়। গাধাটা এতক্ষণে ঝিলের জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেছে।”

হাটতে-হাটতে বললাম, “আমি কিন্তু গাধার পেছনে দৌড়ছি না।”

“নাহ্। আপাতত গাধার পেছনে ছোটা নিরর্থক।”

সোজা এগিয়ে সেই পিচের রাস্তায় পৌঁছলাম দু’জনে! তারপর একটা খালি সাইকেল রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, “জমিদারবাড়ি। তাড়াতাড়ি চলো ভাই।”

আকার-প্রকারে মনে হচ্ছিল, এসব বাড়িকেই হয়তো একসময় বলা হত সাতমহলা পুরী। কিন্তু এখন হতগ্রী অবস্থা। দেউড়ি আছে এবং মাথায় দুটো সিংহও আছে। কিন্তু সিংহের পেট ফুঁড়ে অশ্বখচার গজিয়েছে। দারোগ্যান থাকার কথা নয়। দু’ধারে পামগাছ এবং এবড়ো-থেবড়ো একফালি রাস্তা। পোর্টিকোর তলায় গিয়ে রিকশা থেকে দু’জনে নামলাম। তারপর হলঘরের দরজায় দীপককে দেখলাম। বলল, ‘আসুন, আসুন। ওপর থেকে অপনাদের দেখতে পেলাম। আবার কোনও গুডগোল হয়নি তো?’

কর্নেল বললেন, “নাহ্। তোমার বাবা আছেন?”

“বাবা স্কুলে গেলেন একটু আগে। ম্যানিজিং কর্মিটির মিটিং আছে। উনি তো কর্মিটির সেক্রেটারি। ভেতরে আসুন।”

হলঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন, “হালদারমশাইয়ের খবর কী?”

দীপক হাসল, “ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন! অশ্রুত মানদ্রুশ!”

“আচ্ছা দিপু, তোমাদের পাতালঘরের চাবি কার কাছে থাকে?”

দীপক একটু গম্ভীর হয়ে বলল, “ভজ্জুয়ার কাছে নীচের কিছ্র ঘরের চাবি থাকত। কারণ সেই-ই এসব ঘর দেখাশোনা করত। আসলে ভজ্জুয়া ঘে-ঘরে থাকত, তার পরশে একটা ঘরে পদ্রনো ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ঠাসা আছে। ওই ঘরের কোণাতেই পাতালঘরে নামার গোপন সিঁড়ি আছে।”

“ঘরটা একটু দেখতে চাই। মানে সেই সিঁদ্রুকটা।”

“এক মিনিট! মায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসছি।”

একটু পরে সে চাবির গোছা নিয়ে ফিরে এল। গোলোকধাঁধার মতো কয়েকটা ঘরের ভেতর দিয়ে সেই ঘরটাতে নিয়ে গেল সে। দরজা খুলে সদ্রইচ টিপে আলো জ্বালল। আবর্জনার মতো পদ্রনো চেয়ার-টেবল-খাট ইত্যাদি স্তুপে ঘরটা ভর্তি। এক কোণে কাঠের আলমারি দাঁড় করানো আছে। দীপক সেটা ঠেলে সরাতেই একটা ছোট্ট দরজা দেখা গেল। সে দরজা খুলে গোপন সদ্রইচ টিপে আলো জ্বালল। বলল, “আসদ্রন।”

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট্ট একটা ঘরে পেশীছলাম। কেমন ভ্যাপসা দ্রুগন্ধ। দেওয়ালে সিঁদ্রুরের ছোপে একটা স্বস্তিকা আঁকা। তার নীচেই কালো কাঠের সিঁদ্রুকটা খুলল দীপক। কর্নেলের পকেটে সব সময় টর্চ থাকে দেখছি। টর্চের আলোয় ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। ততক্ষণে দ্রুগন্ধে আমি অস্থির। কর্নেল হঠাৎ ঝুঁকে একটা কালচে ছোট্ট জিনিস সিঁদ্রুকের ভেতর থেকে তুলে নিলেন। উজ্জ্বল মদ্রখে বললেন, “হুঁ! পাওয়া গেল তা হলে।”

দীপক বলল, “কী পাওয়া গেল কর্নেল?”

কর্নেল বললেন, “যা পাওয়া উচিত ছিল। চলো, বেরনো যাক এখন থেকে।”

॥ ৫ ॥

হলঘরে ফিরে কর্নেল বললেন, “এই জিনিসটার খোঁজে ম্যাজিকবাবদ্র ডেরায় হানা দিয়েছিলাম। তার ম্যাজিকের বাস্ক-প্যাটরা তন্নতন্ন খুঁজে যখন পেলাম না, তখন বদ্রুলাম এটা হয়তো সিঁদ্রুকের ভেতর থেকে গেছে। কাপালিকবেশী লোকটি যে-ই হোক, তাকে ম্যাজিকবাবদ্র এটা দিলে প্রাণে মারা পড়ত না। ম্যাজিকবাবদ্র ভজ্জুয়ার সাহায্যে সিঁদ্রুক থেকে তান্দ্রিক আদিনাথের কবন্ধ লাশের হাড়গোড় নিয়ে গিয়েছিল...”

দীপক চমকে উঠে বলল, “ভজ্জুয়ার সাহায্যে? অসম্ভব।”

“সম্ভব ডালিং!” কর্নেল সোফায় বসে চুরট ধরালেন। “ষথের ধনের লোভ সবচেয়ে সাংঘাতিক লোভ। চিন্তা করে দ্যাখো। ওই পাতালঘর থেকে ভজ্জুমার সাহায্য ছাড়া কারও পক্ষে কাজটা সম্ভব ছিল না। তোমার ঠাকুরদার বইয়ে লেখা আছে, কবন্ধ লাশ দুমড়ে-মুচড়ে কাপড়ে বেঁধে সিঁদুকে ঢোকানো হয়েছিল। এককাল পরে কাপড় আশ্রু থাকার কথা নয়। কাজেই হাড়গোড়-গুলো আবার একটা কাপড়ে বা চটের থলেয় ভরে নিয়ে গিয়েছিল দু’জনে। এদিকে মাংস গলে পড়ে কাপড় গুঁড়ো হয়ে এই জিনিসটা সিঁদুকের তলায় খসে পড়েছে এবং সেঁটে গেছে।”

জিনিসটা কর্নেল দেখলেন। বাংলায় দেখা আধখানা চাঁদের গড়ন সেই সিলের বাকি টুকরো বলে মনে হল। বললাম, “একটা গোটা সিল দু’ টুকরো করার কারণ কী?”

কর্নের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, “বইয়ে তান্ত্রিক আদিনাথের ছবি আছে। শিবের জটায় চন্দ্রকলার ছবি দেখেছ তো? ঔর জটাতেও তেমনই আধখানা খুঁদে চাঁদের মতো জিনিস আছে। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি। পরে দেখলাম ঔর ডান বাহুতে তাগার মতো অবিকল একই জিনিস বাঁধা আছে। আতশ কাচে দুটোই পরীক্ষা করে বুঝলাম একটা খুঁদে সিলের দুটো টুকরো। কী সব খোদাই করা আছে ওতে! তখনই বুঝলাম তান্ত্রিক আদিনাথ যত বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁর ভাইপো হরনাথ – মানে, দিপদ্র ঠাকুরদাও তত বুদ্ধিমান ছিলেন। হরনাথ লিখেছিলেন, দেবী চাঁডকার ধনে লোভ করা উচিত নয়। বইয়ে ‘ধ’ হরফ এবং ‘লো’ হরফ পোকায় কেটেছে। তাই দিপদ্র বাবা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। দু-দুটো নরবলির পর ঔর সন্দেহ হয়। তাই আমার কাছে ছুঁটে গিয়েছিলেন!”

দিপদ্র বলল, “বাপস্! মাথা ভেঁ ভেঁ করছে। সেকালের লোকেরা কী অদ্ভুত ছিল!”

“হ্যাঁ। এখন তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু হরনাথ ধর্মপ্রাণ মানুষ। দেবী চাঁডকার ধনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বংশধরদের হাতে দিতে চেয়েছিলেন। ওই ছড়াটা উনি তাই নিজেই রচনা করে লিখে গেছেন। ওর মধ্যে একটা সুত্র লুকানো আছে। সিলের আধখানা তো সিঁদুকে নিরাপদে রইল। বাকি আধখানা খুঁজে বের করার জন্য ওই ছড়া! কিন্তু ছড়াটা কাজে লাগেনি। জগাই জানত, মদু কোথায় পৌঁতা আছে।”

বললাম, “কিন্তু তান্ত্রিক আদিনাথকে বলি দিল কে?” কর্নেল হাসলেন। “ওটা গম্প। আমার থিওরি হল, আসলে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর দেবী চাঁডকার লুকিয়ে রাখা ধন যাতে সহজে কেউ খুঁজে না পায় তাই হরনাথ একটা সাংঘাতিক কাজ করেছিলেন। মৃতদেহের মদু কেটে কোথাও পড়তে

রাখার জন্য....”

বাধা দিয়ে বললাম, “বোগাস। আপনার থিওরির মাথামুঁড়ু নেই। সিলের টুকরো দুটো লুকিয়ে রেখে গেলেই পারতেন! কোনও বন্ধ পাগল ছাড়া মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারে না।”

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “সাড়ে বারোটা বাজে। চলি দিপদু! ওবেলা এসে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।”

দীপক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে গিয়ে বললাম, “জগাই কী করে জানল কোথায় মন্ডু পৌঁতা আছে?”

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ‘তুমি তো কথাটা শেষ করতেই দিলে না। আমি কি বলেছি হরনাথ নিজের হাতে তাম্রক জ্যাঠার লাশের মন্ডু কেটে-ছিলেন? মড়া কাটার জন্য ঠাঁর একজন লোকের দরকার ছিল। জগাইরা পুরুষাখানদ্রুমে এই কাজ করে। হরনাথের বইয়ে একজনের উল্লেখ আছে। তার নাম গদাই। নিশ্চয় জগাইয়ের ঠাকুরদা বা তার বাবা। নামে নামে মিল। এদিকে তো পূর্বপুরুষের কোনও গোপন কথা বংশানুক্রমে পরিবারে চালু থাকে। এই পারবারেও ছিল। আমার থিওরি নিখুঁত, ডালিং!”

“কী করে অত নিশ্চিত হচ্ছেন?”

“জগাই একইভাবে খুন হয়েছে বলে!” কর্নেল গেট পেরিয়ে একটা সাইকেল রিকশা ডাকলেন। তারপর বললেন, “বাংলোয় ফিরে বন্ধিয়ে দেব।”

বাংলোয় পৌঁছে দেখি, হালদারমশাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বললেন, “কাপালিকের ডেরা ডিস্‌কভার করেছি কর্নেল! গড়খাইয়ের ওপারে একটা গদাহার মতো গম্বুজঘরে সে থাকে। কম্বলের তলায় ভাঁজকরা এই চিঠি ছিল।”

কর্নেল ঠাঁর হাত থেকে ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে বললেন, “দিপদু আপনার জন্য ভেবে সারা। শিগগির গিয়ে ওকে দেখা দিন। আর শুনুন! একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। রামদুর্গা গাধার পিঠে একটা বোঁচকা বঁধা আছে। গাধাটা নয়, বোঁচকাটা খুব দরকার।”

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন। “কই? কই সে?”

“খেয়েদেয়ে খুঁজতে বেরোবেন। ঝিলের জঙ্গলেই দেখা পেতে পারেন। কিছুক্ষণ আগে ওকে তাড়া করে ওঁদিকেই পাঠিয়ে দিয়েছি।”

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবুগে উধাও হয়ে গেলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল ইনল্যান্ড লেটারটা পড়ে আমাকে দিলেন। চিঠিতে লেখা আছে :

শঙ্করদা,

পত্রপাঠ চলে আসুন জগাই রাজি হয়েছে। ভজ্জুয়াও রাজি। গতবারের

মতো সাধু সঙ্গে আসবেন। মশানতলায় থাকবেন। মা চণ্ডীর কৃপায় এবার আর ব্যর্থ হব না। প্রণাম রইল। ইতি—

শচীন

নাম-ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা! 'শ্রী এস. এন. ভট্টাচার্য'। কেয়ার অব জয়চণ্ডী অপেরা। ৩৫/১, ঠাকুরপাড়া লেন, কলকাতা-৮।

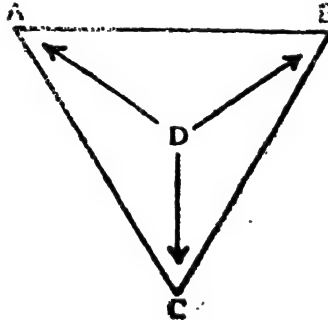
বললাম, “যাত্রাদলের লোক?”

কর্নেল হাসলেন। “তাই তো মনে হচ্ছে। তার পক্ষে কাপালিক সাজা সহজ। এবার এই চিরকুট্টা দ্যাখো। ম্যাজিকবাবু, শচীন হাজারার বাজে পেরেছি।”

চিরকুট্টা দেখেই বললাম, “আমাকে যে চিরকুট্টা ছুঁড়ে কাল বিকেলে ভয় দেখিয়েছিল, তারই লেখা। ম্যাজিকবাবুকে মশানতলায় ডেকেছিল দেখছি। তলায় ইংরেজিতে ‘এস’ লেখা সেই শঙ্করদা!”

“হ্যাঁ। জগাইকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল, ‘এসে গেছি।’ যাই হোক, এবার ব্যাপারটা বদ্বিষে দিই।” বলে কর্নেল তাঁর কিট-ব্যাগ থেকে প্যাড বের করে আঁকজোক শুরু করলেন। তারপর বললেন, “এটা একটা ওলটানো ত্রিভুজ।”

...‘এ’ বিন্দু ভজুয়া, ‘বি’ বিন্দু জগাই এবং ‘সি’ বিন্দু ম্যাজিকবাবু শচীন হাজারা, মাঝখানে ‘ডি’ বিন্দু হল শঙ্কর নামে একটা লোক। যে-কোন কারণেই



হোক শঙ্কর প্রকাশ্যে কংগ্রেসে আসতে পারে না। অথচ সে দেবী চাঁড়িকার গুপ্তধন-রহস্য জানে। সে তিনজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। এতদিন পরে সে ম্যাজিকবাবুর সাহায্যে প্রথমে তান্ত্রিক আদিনাথের ধড় হাতাল। কিন্তু সিলের অধরাংশ পেল না। তখন ম্যাজিকবাবু ওটা হাতিয়েছে সন্দেহ করে তাকে খতম করল। তারপর জগাই মদুড় উদ্ধার করে দিলে। কিন্তু মদুড়তেও সিলের বাকি আধখানা নেই। থাকবে কী করে? মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সন্দেহক্রমে খাশা হয়ে সে জগাইকে খতম করল। কারণ সে ধরেই

নিরোঁছল গদুপ্তধনের লোভে তাকে ওয়া ফাঁকি দিচ্ছে। বাকি রইল ভজ্জুয়া। আমার ধারণা, ভজ্জুয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল শংকর। নিশ্চয় ওকে লোভ দেখিয়ে বাগে এনেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও সন্দেহক্রমে খতম করেছে। গদুপ্তধনের লোভ পেয়ে বসলে মানদুঃ হিংস্র হয়ে ওঠে। তিন-তিনজনকে সে অবশ করে দেবী চণ্ডীকার থানে এনে বলি দিয়েছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু সে আশা ছাড়েনি। দিপদুর বাবা গোয়েন্দা এনেছেন কলকাতা থেকে, সে জেনে গিয়েছে। তাই ভেবেছে, গোয়েন্দার ওপর বাটপাড়ি করবে। আসলে আমাদের হালদারমশাই অতি-উৎসাহে—ঠিক তোমার মতোই...”

বাধা দিয়ে বললাম, “জ্যাক কঙ্কাল চোখের সামনে নাচতে দেখলে মাথার ঠিক থাকে না।”

কর্নেল সেই কালো আধখানা সিলটা লোশন দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকলেন। বললেন, “আজ পূর্ণিমা। আজ রাতে আবার কঙ্কালের নাচ দেখাব তোমাকে। শিওর।”

দুপদুরে আমার ভাতঘদুর্মের অভ্যাস আছে। কিছুদ্ধ পরে কর্নেলের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল। কর্নেল সিলের টুকরো দুটো জোড়া দিয়েছেন। বললেন, “একপিঠে দেবী চণ্ডীকার রণমূর্তি। অন্যপিঠে শূদ্ধ স্বস্তিকাচিহ্ন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। গদুপ্তধনের সূত্র কোথায়? দেবী চণ্ডিকা আর স্বস্তিকা।” কর্নেল টাকে হাত বোলাতে থাকলেন। চোখ বৃজে গেল।

একটু পরে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। বললাম, “গদুপ্তধনটা গুলতাপি নয় তো?”

“কিছু বলা যায় না। যাক্‌গে, চলো। বেরনো যাক।”

“গদুপ্তধনের খোঁজে?”

“নাহ্‌। থানায়।”

“থানায় যেতে আমার ভাল লাগে না। আপনি যান।”

কর্নেল উঠে দরজার কাছে গিয়ে বললেন, “ঠিক আছে। বরং তুমি রামদুর গাধাটা ধরতে হালদারমশাইকে সাহায্য করতে পারো। ওই দ্যাখো, ঝিলের দক্ষিণের ঘাটে হালদারমশাই ওত পেতে বসে আছেন।”

বারান্দায় গিয়ে দেখি, সত্যি তা-ই। হালদারমশাই ঘাটের পাশে একটা ঝোপের ধারে বসে আছেন! গাধাটা দেখতে পেলাম না। কর্নেল চলে যাওয়ার পর রঘুলালকে ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে বেরিয়ে পড়লাম। নীচের রাস্তায় নেমোঁছ, হালদারমশাইয়ের চিৎকার শোনা গেল।

“জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু! গাধা! গাধা!”

পিঠে বোঁচকাবাঁধা গাধাটা জঙ্গল কুঁড়ে ছুটে আসছিল। আমি দুঃহাত

তুলে এগিয়ে যেতেই ঝিলের ঢালে নেমে গেল। তারপর দিবা জলজ্বাসের দিকে মদ্য বাড়াল। আমি রঘুলালকে ডাকলাম। সে দৌড়ে এল। বললাম, “গাথাটা ধরতে হবে। বকশিশ পাবে রঘুলাল।”

হালদারমশাই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, “গাথা কয় আর কারে !”

রঘুলাল একটা মজার কাজ পেয়ে গেল যেন। সে বলল, “জঁচামেচি না করে তিনজনে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরতে হবে সার। রামদর গাথাটা খুব বদমাশ ! লাথি ছুঁড়তে পারে।”

হালদারমশাই বললেন; “দাঁড়ি লও রঘুলাল ! আমার কাছে দাঁড়ি আছে।”

রঘুলাল দাঁড়ি নিয়ে পা টিপে-টিপে এগোলো। বললাম, “দাঁড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন নাকি ?”

হালদারমশাই হাসলেন। “নাহ্। কাইল রাত্রে কাপালিক আমারে এই দাঁড়ি দিয়া বাঁধিছিল না ?”

রঘুলাল চাপা গলায় বলল, “আপনারা দু’দিকে রেডি থাকুন সার !”

সে কাছাকাছি যেতেই গাথাটা ধরল। অমনই রঘুলাল তার গলায় দাঁড়ি ফাঁস আটকে দিল। হালদারমশাই এবং আমি গিয়ে দাঁড়ি ধরে ফেললাম। টাগ অব ওয়ারে শেষপর্যন্ত গাথাটা পরাস্ত হয়ে ঘাসে পড়ে গেল। হালদারমশাই তার পিঠ থেকে বোঁচকাটা খুলে নিয়ে বললেন, “খুব জন্ম এবার। রঘুলাল ! ওকে ছেড়ে দাও ! কিন্তু ইস্‌স্‌ ! বোঁচকাটায় কী বিটকেল গন্ধ !”

গাথা বেচারা গলায় দাঁড়ি ফাঁস নিয়ে নড়বড় করে দৌড়ে রাস্তায় উঠল। বদমাশ, বদমাশমান গাথা। জঙ্গলে ঢুকলে দাঁড়িটা কোথাও আটকে গিয়ে বিপদে পড়ত।

হালদারমশাই বাংলায় এলেন আমার সঙ্গে। কর্নেল নেই শূনে নিরাশ হলেন। বোঁচকা থেকে সত্যি বিকট দুর্গন্ধ ছড়চ্ছিল। সেটা এনে ফেলে রেখে বারান্দায় বসলাম আমরা। রঘুলাল কফি করতে গেল। হালদারমশাই সন্দেহভাবে বললেন, “বোঁচকায় কী আছে যে, এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গাথার পিঠে এটা বাঁধলই বা কে ?”

হাসতে-হাসতে বললাম, “খুলে দেখুন না ! গুপ্তধন থাকতেও পারে।”

হালদারমশাইয়ের ধৈর্য রইল না আর। উঠে গিয়ে নোংরা কাপড়ের বোঁচকাটা খুলে ফেললেন। তারপর লাফিয়ে উঠে বললেন, “সর্বনাশ ! মড়ার খুলি আর হাড়গোড়ে ভর্তি !”

চমকে উঠেছিলাম। বুক ধড়াস করে উঠেছিল। বললাম, “এই সেই তাত্ত্বিক আদিনাথের কঙ্কাল !”

বোঁচকাটা ঝটপট বেঁধে হালদারমশাই বললেন, “আপনি কাইল রাত্রে দেখেছিলেন, একটা কঙ্কাল আমারে বলি দিতে চাইছিল ? হেই ব্যাটা ! কিন্তু

খড়গ গেল কই ?”

বললাম, “কাপালিকের কাছে ।”

“হঃ । ঠিক কইছেন ।” বলে হালদারমশাই বারান্দায় এলেন । ধপাস করে বসে জোরে শ্বাস ছাড়লেন । বোঝা গেল, এতক্ষণে উনি বেজায় উত্তেজিত ।

একটু করে কফি খেতে-খেতে আমরা গদুপুত্ৰন রহস্য নিয়ে আলোচনা করছি, রঘুলাল ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং লনে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে ঝিলের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ বলল, “কর্নেলসাব আসছেন । ওই দেখুন ।”

ঝিলের ধারে জঙ্গলের ভেতর কর্নেলকে হস্তদস্ত আসতে দেখলাম । হালদার-মশাই হস্তদস্ত গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন । কিছদক্ষণ পরে গেটের নীচে কর্নেলের ট্রুপি দেখা গেল । হালদারমশাই জয়ের উল্লাসে বলে উঠলেন, “বোঁচকার ভেতর স্কোলিটন অ্যান্ড স্কাল !”

সাড়স্বরে ঘটনার বিবরণ দিতে-দিতে হালদারমশাই কর্নেলের সঙ্গে বাংলোর বারান্দায় ফিরে এলেন । রঘুলাল আবার কফি করতে গেল । বললাম, “গেলেন তো থানায় । ফিরলেন জঙ্গল থেকে । নিশ্চয় অর্কিড খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন না জঙ্গলে ?”

কর্নেল হাসলেন । মৃদু ক্রান্তির ছাপ । বললেন, “ফাঁদ পাততে গিয়েছিলাম ।”

“কিসের ফাঁদ ?”

“কাপালিক ধরার । হালদারমশাই ওর ডেরার খোঁজ দিয়েছেন । সেই ডেরার ঢুকে গদুপুত্ৰনের সূত্র অর্থাৎ সিলটা রেখে এলাম । সঙ্গে একটা চিঠি । সম্ভা সাতটার ঝিলের পূর্বের ঘাটে বড়ো শিবের মন্দিরের সামনে দেখা করতে লিখেছি । শত দিনেছি, গদুপুত্ৰনের আধাআধি বখরা চাই । দেখা যাক টোপ গেলে কি না । গদুপুত্ৰনের লোভ অবশ্য সাম্ভাতিক ।”

অবাক হয়ে বললাম, “সিলটা রেখে এসেছেন ! করেছেন কী !”

কর্নেল চাপা স্বরে সর্কোতুকে বললেন, “বলোছি ডালিং, আজ রাতে কংকালের নাচ দেখব । আর হালদারমশাই স্বচক্ষে দেখবেন তাঁকে কে বলি দেবে বলে শাসাচ্ছিল ।”

হালদারমশাই বললেন, “সে-ব্যাটা তো ওই বোঁচকার ভেতর বাঁধা আছে ।”

“হালদারমশাই ! প্রেতাশ্বা তার কংকালসুন্দর বোঁচকা থেকে বেরিয়ে পড়বে । যাই হোক, রঘুলালকে দিয়ে ওটা আপাতত বাথরুমে রাখতে হবে । এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে । পোনে সাতটার আমরা বড়ো শিবমন্দিরের ওখানে পৌঁছব ।”

একটা চূড়ান্ত মূহুর্তের দিকে পৌঁছতে গেলে যা হয় । সময় যেন কাটতে চায় না । সাড়ে ছটার আমরা বেরিয়ে পড়লাম । নীচের রাস্তা দিয়ে ঘুরে

ঝিলের উত্তর পাড় ধরে কর্নেল এগোলেন। স্তূপ, খানাখন্দ, ঝোপঝাড় পেরিয়ে মোটামুটি ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সবে চাঁদ পূর্বের গাছপালার মাথা আলো করে উঁকি দিচ্ছে। হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, “আরে ! এখানেই তো কাপালিক মাটি খুঁড়ছিল।”

কর্নেল বললেন, “হ্যাঁ। খুঁলি পোঁতা ছিল এখানেই। ওই দেখুন, বড়ো শিবের মন্দির। চুড়োয় একটা ত্রিশূল পোঁতা আছে।”

এই সময় কাছাকাছি কেউ বলে উঠল, “এসে গোছি কর্নেল !”

“চলে এসো দীপদ !”

দীপক একটা স্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। হাতে সেই বসম আর টর্চ। কর্নেল আমাদের নিয়ে ফাঁকা জমিটায় গেলেন। তারপর বললেন, “সবাই মন্দিরের আড়ালে যাও। কুইক ! দিপদ, এদের নিয়ে যাও। সাবধানে ! টু শব্দটি করবে না।”

কতকালের পূর্বনো মন্দির। তার একপাশে ঘন ছায়ায় আমরা তিনজনে বসে রইলাম। কর্নেল ফাঁকা জমিটায় পায়চারি করছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, একটু পরে ঠেকে সেই ছড়াটা আওড়াতে শুনলাম। ছড়াটা বার-দুই আওড়েছেন, কেউ খানখ্যানে গলায় বলে উঠল, “ওঁ, হুইং ক্লীং ফট্ !” তারপর দপ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। পেছনে ঘন ঝোপ। ঝোপের মাথায় মশালটা আটকানো মনে হল।

হঠাৎ ঝোপ ডিঙিয়ে একটা আশ্রয় নরককাল লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল। তার দু’হাতে ধরা একটা চকচকে খাঁড়া নেড়ে তেমনই ভুতুড়ে গলায় বলল, “এসেছিস ? আয়, আয় ! কাছে আয়।”

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, “দেবী চাঁড়কার গুপ্তধন কি উদ্ধার হয়নি ?”

“কাছে আয়। কথা হবে।”

“আর কিসের কথা মশাই ? সিল তো পেয়ে গেছেন।”

ককাল খাঁড়া নামিয়ে বলল, “চালাকি ? আমি কে জানিস ? আমি তান্ত্রিক আদিনাথ। আমার দেবীর ধন। আমার সঙ্গে ফকুড়ি ? তবে রে ব্যাটা বড়ো টিকটির্কি !”

এবার যেন কর্নেলেরই আমার মতো মাথা খারাপ হয়ে গেল। টিকটির্কি বলার জন্যই কি খেপে গেলেন ? রিভলবার বের করে দৌড়ে গেলেন। ককালটা তড়াক করে ঝোপ ডিঙিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। ঝোপে আটকে গেল। তারপর হঠাৎ ঝোপের ওপাশে অনেক টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ধূপধাপ, দৃন্দাড়, ছুটোছুটি শব্দ। আমরা দৌড়ে কর্নেলের কাছে গেলাম। কর্নেল সেই ককালটা ঝোপের ডগা থেকে নামিয়ে এনে বললেন, “ম্যাজিকবাবু, ম্যাজিক

কংকাল ! ম্যাজিকের স্টেজে পদ্মভূলনাচের কৌশলে পেছন থেকে প্লাস্টিকে তৈরি কংকালটাকে দাঁড় করানো কন্ট্রোল করা হত । হুঁ, খাড়াটা দেখছি পিস্‌বোর্ডে মোড়া রাস্তার । বলে হাঁক ছাড়লেন, “কই মিঃ খাড়া ! আপনার আসামী কোথায় ?”

ঝোপের পেছন থেকে সাড়া এল, “বন্ড বেয়াড়া আসামি ! এক মিনিট কর্নেল !”

তারপর সদলবলে বেরিয়ে এলেন সত্যিকার খাড়া হাতে এক দারোগাবাবু । তাঁর পেছনে কনস্টেবলরা লাল কাপড়পরা এক কাপালিককে বেঁধে নিয়ে এল । দারোগাবাবু বললেন, “খাড়াটা দেখেছেন ? হাতে এটা ছিল বলেই অ্যারেস্ট করতে একটু দেরি হল ।”

কর্নেল কাপালিকের জটাজুট এবং গোঁফদাড়ি হ্যাঁচকা টানে খুলে দিয়ে টর্চ জ্বলিয়ে বললেন, “দ্যাখো তো দিপু, লোকটাকে চিনতে পারো কি না ?”

দীপু অবাক হয়ে বলল, “এ কী ! শঙ্করকাকা না ?”

“হ্যাঁ । তোমার বাবার জ্যোতিভাই শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য তোমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছিল । তুমি তখন আসানসোলে কলেজ-স্টুডেন্ট । তোমার বাবার কাছে জেনে নিয়ে কী সাম্প্রতিক আর জন্ম চরিত্রের লোক এই শঙ্করনাথ । মিঃ খাড়া ! আসামি নিয়ে থানায় চলুন । আমি পরে দেখা করব ।”

দারোগাবাবু এবং কনস্টেবলরা আসামি নিয়ে চলে গেলেন । হালদারমশাই কংকালটা পরীক্ষা করছিলেন । থি-থি করে হেসে বললেন, “কী কান্ড ! আমি ভাবছিলাম বোঁচকা থেকে বেরিয়ে—থি-থি-থি !”

বললাম, “কিন্তু ওই অশুভ ছড়াটার মানে কী ?”

কর্নেল, বললেন, “ওই দ্যাখো, ‘বার-পনেরো-চাঁদ’ উঠেছে । বড়ো শিবের ত্রিশূলের ছায়া কোথায় পড়েছে লক্ষ্য করো ! ওখানে খুঁলিটা পোতা ছিল । হুঁ, গোড়া থেকে বদিয়ে দিই । ‘অট্টঘাট বাঁধা’ নয়, কথটা হল অট্টঘাট বাঁধা । এই ঝিলের চারদিকে বাঁধানো ঘাট আছে । বড়ো শিবের মন্দির তো দেখতেই পাচ্ছ । ‘বার পনেরো চাঁদ’ মানে বারো নম্বর মাস অর্থাৎ চৈত্র মাস । ‘পনেরো’ হচ্ছে চাঁদের পঞ্চদশী তিথি । তার মানে চৈত্র মাসের পূর্ণিমার চাঁদ যখন বড়ো শিবের ত্রিশূলের মাথায় দেখা যাবে, ত্রিশূলের ছায়া যেখানে পড়বে, সেখানেই খুঁলি পোতা আছে । তাই ছড়ায় আছে : ‘বড়ো শিবের শুলে । আমার মাথায় ছুঁলে ।’ কিন্তু চুড়ার জট ছাড়ানোর আগেই জগাই খুঁলির খোঁজ দিয়েছিল শঙ্করনাথকে ।

“গদগুধনের কী হল ?”

“তুমি ভুলে গেছ জয়ন্ত, পাতালঘরের দেওয়ালে আমরা সিঁদুরে আঁকা

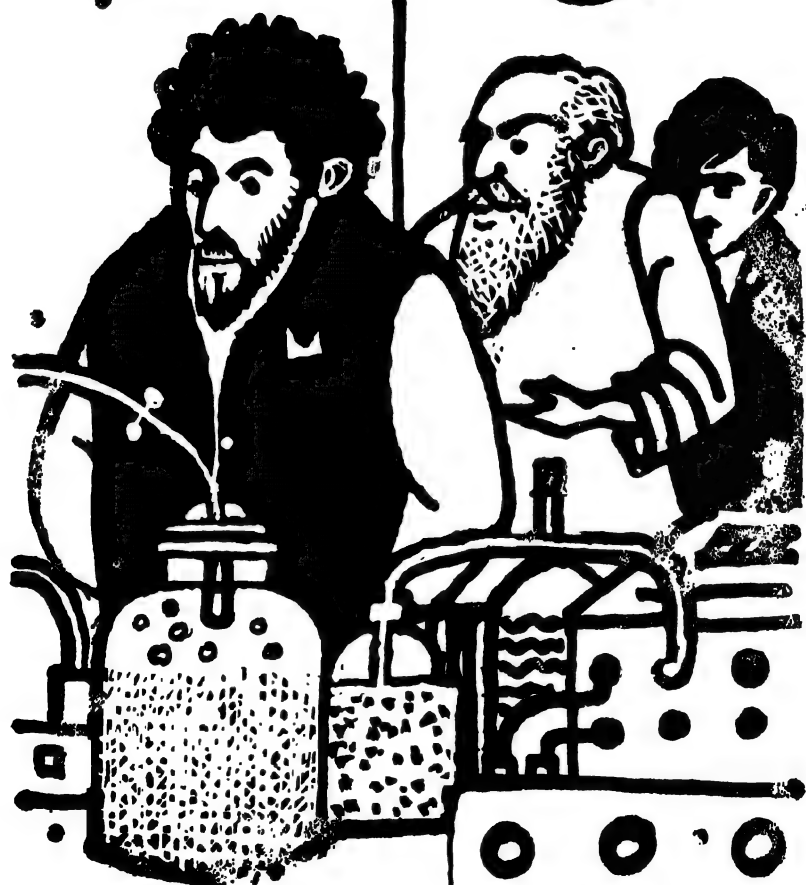
স্বস্তিকাচিহ্ন দেখেছি। সিলের একপিঠে স্বস্তিকা আছে। অন্যপিঠে দেবী চণ্ডীকামর মূর্তি। ওই মূর্তিটাই গদুপ্তধন। প্রায় এক কোজি ওজনের সোনার দেবীমূর্তি। থানায় খবর দিয়ে দিপদদের বাড়ি গিয়ে গদুপ্তধন উদ্ধার করেছি। স্বস্তিকা আঁকা ছিল যেখানে, সেখানে ঝড়তেই সোনার মূর্তি পাওয়া গেল। কাজেই সিলটা শংকরনাথের ডেরায় রেখে এসেছিলাম। ওটাই ফাঁদ। বদ্বলে তো ?

হালদারমশাই উদাস চোখে চাঁদ দেখছিলেন। বললেন, “চলেন কর্নেলসার। বাংলায় গিয়া বৌচকাটা দেখা দরকার।”

কর্নেল কঙ্কালটা দিব্য ভাঁজ করে গদুটিয়ে বললেন, “বৌচকা আছে। শংকরনাথ-তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল আর খুলিতে সিল না পেয়ে থাম্পা হয়ে ওটা রামদুর গাখার পিঠে বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু গাখাটাকে এই কাজে লাগাতে হলে রামদুরকে ভয় দেখিয়ে ঘাট থেকে তাড়ানো দরকার ছিল। তাই ম্যাজিকবাবুর কঙ্কাল দেখিয়ে বেচারাকে ভাগিয়ে দেয়। আস্ত কঙ্কালের নাচ দেখে রামদুর পাগল হওয়া স্বাভাবিক। তবে এবার ওকে সন্দ্বুদ্ধ করা যাবে।”

আমরা বাংলায় ফিরে চললাম।

স্বাধীনতার
ঝিলা



প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার অর্থাৎ আমাদের প্রিয় ‘হালদারমশাই’ সবগে ঘরে ঢুকে সশব্দে সোফার বসে ফ্যাসফেসে গলায় বলেন, “অসম্ভব !” অবিশ্বাস্য ! অশু-উ-ত !”

তার চোখ দুটো গুলি-গুলি এবং গোফের ডগা তির তির করে কাঁপছিল। এ-পকেট ও-পকেট খোঁজাখুঁজি করে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, “ফ্যালাইয়া আইছি।”

বদ্বলাম জিনিসটা নস্যর কোটো। উত্তেজনার সময় ঠুঁর মূখে মাতৃভাষা বেরিয়ে আসে। তাছাড়া খানিকটা নাটুকে স্বভাবের মানদ্বণ্ড বটে। সামান্য ব্যাপারে তিলকে তাল করে ফেলেন। পেশাদার গোয়েন্দা হওয়ার দরুণ সবসময় সবকিছুতে সন্দ্বিধ হয়ে রহস্য খোঁজেন।

বিশালদেহী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বদ্বজে সম্ভবত কোনও দ্বল্লভ প্রজাতির প্রজাপতি দেখাছিলেন এবং সাদা দাড়িতে হাত বদ্বলিয়ে সেটির জৈব গোত্র বিচার করছিলেন। জানালা দিয়ে ছটকে পড়া রোমদ্বরে ঠুঁর চওড়া টাক ঝকঝক করছিল। বললেন, “অশুভূতের সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক আছে হালদারমশাই !”

“হঃ ! ঠিক কইছেন।” হালদারমশাই সোজা হয়ে বসলেন। ভূত। ভূত !”

হাসি চেপে বললাম, “কোথায় দেখলেন হালদারমশাই ?”

হালদারমশাইয়ের মূখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বললেন, “চৌতরিশ বৎসর পদ্বলিশে সার্ভিস করছি। রিটার্ডার্ড লাইফে প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাজেন্সি খদ্বলছি। ডায়াগারাস-ডায়াগারাস ক্যাস হাতে লইছি। কখনও ভূত দেখি নাই। কাইলই রাত্রে স্বচক্ষে দেখলাম।”

“ভূত দেখলেন ?”

“হঃ ! ভূত ছাড়া কী ? নিজের একখান চক্ষু খদ্বইলা বেসিনে রাখল। জলে খদ্বইয়া ফের পইরা লইল।”

হাসতে-হাসতে বললাম, “নকল চোখ বা নকল দাঁত অনেকেই প করেন।”

হালদারমশাই চটে গিয়ে বললেন, “জয়ন্তবাবু ! আমি পোলাপান না ; বেসিনের জলে রক্ত দেখছি।”

ভূতের শরীরে রক্ত থাকে নাকি ?”

হালদারমশাই আরও খাম্পা হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। ঠুঁর জন্য স্পেশাল কফি অর্থাৎ তিনভাগ দ্বদ্ব একভাগ লিকার। উনি কফির দিকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আমার বদ্ব প্রকৃতিবিদ বদ্বদ্ব এতদ্বন্ধে চোখ খদ্বলে কফির পেয়াদা ভুলে

নিলেন। অভ্যাসমতো আওড়ালেনও “কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে।” তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ডারউইনসায়েরের বিবর্তনবাদ ভূতের ক্ষেত্রেও খাটে ডার্লিং! নিগ্নানডরথাল মান্দুষ থেকে ক্রোমাগনন মান্দুষ। তা থেকে হোমো-সাপিয়েন্স-সাপিয়েন্স, আমরা যে-মান্দুষ। সেইরকম আদিম ভূত থেকে বর্তমান ভূত। এ-ভূতের রক্তও থাকতে পারে। হালিউডে তৈরি সায়েবভূতের ছবি দেখেছ। ড্রাকুলার ভূত রক্তচোবা ভূত ছিল। দীর্ঘ ভূত ঘাড় মটকাত। কিন্তু রক্ত খেত না। বিলিতি ভূতের চরিত্রই অন্যরকম। তারা যেমন রক্ত খায়, তেমনই তাদের শরীরে রক্তও থাকে। আধুনিক সায়েবভূত কীরকম, চিন্তা করো!”

হালদারমশাই গদলি-গদলি চোখে তাকিয়ে কফি খাচ্ছিলেন। বললেন, “কর্নেলসার! ঠিক ধরেছেন। লোকটার চেহারা সাহেবগো মতো।”

এবার একটু আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, “ব্যাপারটা খুলে বলুন তো হালদার-মশাই!”

কফি শেষ করে হালদারমশাই যা বললেন তা মোটামুড়ি এই :

গতকাল সন্ধ্যায় তিনি দমদম এলাকায় এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত প্রায় দশটা হয়ে যায়। যশোর রোডের মোড়ে ট্যাক্সি বা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। শীতের রাত। ঘন কুয়াশা। রাস্তাঘাট সুনসান নিখুম। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর পাশ দিয়ে একটা লোক রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার মধ্যখানের আইল্যান্ডে বাগান করেছে পদ্রসভা। কোপকাড়ে কালো হয়ে আছে। লোকটা সেখানে যেতেই কেউ সেই কোপ থেকে বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ল। অমনই লোকটা তাকে দৃ' হাতে ধরে ওপরে তুলে আছাড় মারল। তারপর হনহন করে এগিয়ে ওপারের একটা বাড়ির গেটে ঢুকে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা।

পর-পর কয়েকটা গাড়ি চলে যাওয়ার পর হালদারমশাই দৌড়ে গেলেন। আবছা আলোর দেখলেন, দলাপাকানো রক্তাক্ত একটা দেহ ফুটপাথ ঘেঁষে পড়ে আছে। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ হলে চ'্যাচামোঁচ করে লোক ডাকত। কিন্তু হালদারমশাই স্বভাব-গোয়েন্দা। তাই সেই শক্তিমান লোকটার খোঁজেই ছুটে গেলেন।

গেটটা জরাজীর্ণ এবং ভেতরে প্রায় একটা জঙ্গল। তার ভেতর হানাবাড়ির মতো একটা দোতলা বাড়ি। ছায়ার আড়ালে গুড়ি মেরে এগিয়ে হালদারমশাই পাঁচিল ডিঙালেন। আগাছার জঙ্গলে ঢুকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ নীচের একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

সাহস করে এগিয়ে একটা খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, সেই লোকটা বাথরুমে বসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার নিজের মূখ দেখছে।

একটা চোখ রক্তাক্ত। হালদারমশাই বদ্বলেন, আততায়ীর গুলি তার চোখেই লেগেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সে সেই চোখটা উপড়ে নিয়ে বেসিনের ট্যাপ খুলে ধুল। চোখের গর্ত থেকে সম্ভবত খুঁদে গুলিটাও টেনে বের করে ফেলল। তারপর চোখটা আবার পরে নিল।

দৃশ্যটা শব্দ ভয়ঙ্কর নয়, বীভৎসও। এই পর্যন্ত দেখে হালদারমশাইয়ের নার্ভের অবস্থা শোচনীয়। তিনি আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে পালিয়ে এলেন। ততক্ষণে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। গাড়ি চাপা পড়ে দুর্ঘটনা ধরে নিয়েই তারা উত্তেজিত। কিন্তু গোয়েন্দার স্বভাব। হালদারমশাই গুলির শব্দ শুনছেন। তাই আগ্নেয়াস্ত্রটি খুঁজছিলেন। একটু পরে তা দেখতেও পেলেন। পয়েন্ট ২২ ক্যালিবারের কালচে রঙের রিভলবারটা পড়ে আছে হাত তিরিশেক দূরে ফুটপাথের ওপর। লোকের চোখ এড়িয়ে সেটি কুড়িয়ে নিলেন। তারপর গ্যারাজগামী একটি বাস দৈবাৎ পেয়ে গেলেন।

সারারাত ঘুমোতে পারেননি হালদারমশাই। পদলিখকে জানাতে ভরসা পাননি। কারণ তাকে নিয়ে পদলিখমহলে প্রচুর ঠাট্টাবাদ্ধুপ চালু আছে। তা ছাড়া নিজেই এই রহস্যের সমাধান করার লোভ রয়েছে। তাই ভেবেচিন্তে ‘কর্নেলসারের’ লগে কনসাল্ট করতে এসেছেন।...

কর্নেল চোখ বন্ধে শুনছিলেন। দাঁতের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট। বললেন, “সাহেবের মতো চেহারা?”

হালদার মশাই বললেন, “কতকটা মানে, মড়ার মতো দেখতে। মাথায় ঝকিড়া চুলগুলি কেমন লালচে। গড়নে আমার মতো লম্বা। তবে রোগাও না, মোটাও না।”

“বয়স অনুমান করতে পারেন?”

হালদারমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, “জয়ন্তবাবুর কাছাকাছি হইব।”

“তা হলে শব্দক বলা চলে।”

“হঃ! জয়ন্তবাবুর মতোই গোঁফদাড়ি কিছুই নাই।”

“পোশাক?”

“প্যান্ট সোয়েটার। সোয়েটারের রং রু—সরি! নেভিব্লু।” বলে হালদার-মশাই জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে খুঁদে একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল রিভলভারটি কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখার পর বললেন, “সিক্স-রাউন্ডার চিনে অস্ত্র। কাজেই চোরা বেআইনি জিনিস। এটা আমার কাছে রাখতে আপত্তি আছে হালদারমশাই?”

হালদারমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, “নাহ্। তবে কর্নেলসার, এখনই সেই বাড়িটা চেক করনের দরকার। চলেন, যাই গিয়া।”

উৎসাহের সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেই সময় ডোর-বেল বাজল। বস্‌টী একটু পরে একটা নেমকার্ড এনে বলল, “এক সায়েব বাবামশাই! বেরং নাক।”

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, “নিয়ে আয়।” তারপর অস্‌ট্রিট টেবিলের জুয়ারে ঢোকালেন।

হালদারমশাই খপাস করে বসে পড়েছিলেন। আমিও একটু চমকে উঠেছিলাম। সায়েবভূতের কথা শোনার পর ‘বেরং’ অর্থাৎ কিনা বহং নাক-ওলালা সায়েবের আবির্ভাবে বৃদ্ধ ধড়াস করে ওঠারই কথা। হালদারমশাই গুলি-গুলি নিষ্পলক চোখে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেল কার্ডটা টেবিলে রেখে বললেন, “পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত ম্যাডান জুয়েলার্সের মালিক এফ এস ম্যাডান।”

হালদারমশাই আশ্চর্য হয়ে শ্বাস ছাড়লেন। আমিও।

সন্‌টপরা ঢাঙা রোগাটে গড়নের এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করে ইংরেজিতে বললেন, “আমি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলতে চাই।”

“হিরেচুরি সম্পর্কেই কি?”

ম্যাডান একটু হেসে বললেন, “তা হলে আমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।”

“আপনি বসুন। তবে কী অর্থে আমাকে ঠিক লোক বললেন, জানি না। আপনার বাড়ির গোপন বেসমেন্টে রাখা ইম্পাতের ভল্ট থেকে ১৮২ ক্যারেটের একটা হিরে চুরির খবর গত মাসে কাগজে সর্বিস্তার বেরিয়েছিল। আপনার দাবি, হিরেটি নাকি ঐতিহাসিক।”

ম্যাডান আমাদের দেখে নিয়ে বললেন, “আমার কিছু গোপন কথা আছে।”

কর্নেল আমাদের দু'জনের পরিচয় দিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, “আপনার গোপন কথা এঁদের কাছে আমি গোপন রাখতে পারব না, মিঃ মাদান। কাজেই—”

ম্যাডান গুঁর কথার ওপর বললেন, “কী বললেন? মাদান? আপনি তা হলে পারসি ভাষা জানেন?”

“সামান্যই। ম্যাডান স্ট্রিট বাঁর নামে, তিনিও আপনাদের জোরাস্তারি ধর্মের লোক ছিলেন। বাঙালি বসু যেমন ইংরেজিতে বোস হয়েছেন, মাদানও তেমনি ম্যাডান। যাই হোক, বলুন আপনার গোপন কথা।”

ম্যাডান একটু ইতস্তত করে বললেন, “একমাস হয়ে গেল, পদলিখ কিছু করতে পারল না। ফোরেনসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, লেসার রশ্মি দিয়ে ইম্পাতের ভল্টের একটা অংশ গলিয়েছে চোর। বেসমেন্টে ঢাকার গোপন

দরজার লকও গলিয়েছে। এই পর্যন্তই।”

“আপনি বলেছেন, হিরেটা ঐতিহাসিক। একটু বুঝিয়ে বলুন।”

“পারসিক সাসানীয় বংশের শেষ সম্রাট ইয়াজ্‌দগির্দের মদুটে এই হিরে বসানো ছিল। তিনিও আমাদের জোরাস্তারি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বর্তমান বাগদাদের কিছু দূরে হিরার যুদ্ধে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিনি আরবদের হাতে পরাজিত হন। তাঁর মদুট থেকে পবিত্র হিরেটি খুঁজে নিয়ে পালায় তাঁর এক অনুচর। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। প্রায় সাড়ে তেরশো বছর এ-হাত ও-হাত ঘুরে হিরেটি যায় এক ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের হাতে। তাঁর বংশধর গত জুন মাসে নিউ ইয়র্কের নিলামঘরে সেটি বেচতে দেন। ১২ লক্ষ ডলারে আমার এজেন্ট কিনে নেন। বিশ্বের সব বড় নিলামকেন্দ্রে আমার এজেন্ট আছেন।” ম্যাডান একটু দম নিয়ে বললেন, “দুঃখের কথা কী জানেন কর্নেল সরকার? এই অধম ফিরুজ শাহ্ মাদানেরই পূর্বপুরুষ সম্রাট ইয়াজ্‌দগির্দের সেই অনুচর। প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যও আপনাকে দেখাতে পারি।”

বর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন, “বলুন, আমি কী করতে পারি?”

ম্যাডান করুণ মুখে বললেন, “পবিত্র হিরে আপনি উদ্ধার করে দিন। এর জন্য যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, পুর্লিশের পক্ষে এ কাজ দুঃসাধ্য।”

“নিউ ইয়র্কের নিলামঘরে আপনার এজেন্টের নাম কী?”

“টোড পিগার্ড। খুব বিখ্যাত লোক। জমিজমা-সম্পত্তির কারবারি। আবার অন্যের হয়ে নিলামঘরে হরেকরকম জিনিস নিলামেও ডাকেন। বলা দরকার কর্নেলসাহেব, আমার মতো ঠাঁহু অনেক মক্কেল আছেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে মক্কেলদের সঙ্গে ঠাঁহু বোঝাপড়া আছে। কোন জিনিস কোন মক্কেলের হয়ে নিলামে কিনতে চাইছেন বা কেনেন, তা পিগার্ড এবং সেই মক্কেল ছাড়া ঘৃণাক্ষরে আর কেউ জানতে পারবে না। পিগার্ড তা জানাবেন না। আপনি তো জানেন, ব্যবসাবাণিজ্যে কিছু নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।”

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বলে উঠলেন, “হঃ! ট্রেড সিক্রেট।”

“ট্রেড সিক্রেট!” সায় দিলেন ম্যাডান। “এভাবে বহু রত্ন আমি পিগার্ডের মারফত কিনেছি। প্রায় কুড়ি বছরের যোগাযোগ তাঁর সঙ্গে। এই পবিত্র হিরে যে নিলামে বিক্রি হবে, তা পিগার্ডই আমাকে জানিয়েছিলেন। তার কারণ বুঝতেই পারছেন। জোরাস্তারি সম্রাটের মদুটের হিরে এবং আমিও একজন জোরাস্তারি। তো শুনাই আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম।

আমাদের পরিবারে বংশপরম্পরা এই হারানো হিরের কাহিনী চালু আছে। আমার ঠাকুরদার হাতে লেখা বৃত্তান্তে এর উল্লেখ আছে। খবর পেয়েই চলে গেলাম নিউ ইয়র্ক। পিগার্ডকে বললাম, এই হিরে আমার চাই। চিন্তা করুন কর্নেলসান্নেব, এ-যাবৎকাল সর্বোচ্চ দরে ওই নিলামঘরে একটুকরো হিরে বিক্রি হল। রেকর্ড দর!”

কর্নেল বললেন, “পিগার্ডকে আপনি বলেছিলেন হিরেটার সঙ্গে আপনাদের পরিবারের সম্পর্ক আছে?”

“নাহ্।” ম্যাডানসান্নেব চাপাগলায় বললেন, “বলিনি। তার কারণ পিগার্ড তা হলে বেশি কমিশন দাবি করতেন।”

“আপনার বাড়িতে আর কে আছেন?”

“আমার মেয়ে খুরশিদ আর জামাই কুসরো। আমার স্ত্রী পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন।”

“আর কেউ আছেন?”

“আম্মা, খানসামা, বাবুর্চি, আমার ড্রাইভার, দারোয়ান—এরা আছে। কিন্তু পবিত্র হিরের ব্যাপারটা তাদের জানার কথা নয়।”

“আপনার মেয়ে-জামাইয়ের?”

“তারা জানত।”

“আপনার জামাই কী করেন?”

“আমার দোকানের দায়িত্ব তারই হাতে।”

“কলকাতার আপনার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় আছেন?”

“অবশ্যই আছেন।”

হালদারমশাই ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। নিজস্ব ইংরেজিতে বললেন, “ইল্লোর ডটার বাই সিলিপ্ অব টাং—”

ম্যাডান রুষ্টভাবে বললেন, “নো!”

হালদারমশাই দমে গিয়ে আবার ফেলে আসা নস্যর কোটো খুঁজতে থাকলেন। কর্নেল বললেন, “যাই হোক। সম্রাট ইয়াজদগারদের হিরে যে আপনার বাড়িতে আছে এবং কোথায় লুক্কানো আছে, সে-কথা কেউ জানতে পেরেছিল। সে যদি সত্যি লেসার রশ্মি ব্যবহার করে থাকে, তাহলে বুদ্ধিতে হবে, সে একজন বিজ্ঞানী। কারণ এখনও বিজ্ঞানী ছাড়া লেসার রশ্মি ব্যবহার কেউ করতে জানে না। করার ঝুঁকি সাম্প্রতিক।”

“পুলিশও তাই বলছে।” বলে ম্যাডানসান্নেব কোর্টের ভেতর পকেট থেকে একটা ব্যাঙ্কের চেকবই বের করলেন। “ফি-বাবদ আপনাকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে চাই কর্নেল সরকার। আমি আজ বিকেলের প্লেনে ক’দিনের জন্য বাইরে যাব। দরকার হলে আমার বাড়ি বা দোকানে টেলিফোনে

কুসরোর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাকেও বলে যাব আপনার কথা।”

ম্যাডান চেকবই খুললে কর্নেল বললেন, “দুঃখিত মিঃ ম্যাডান। আমি ফি নিই না।”

“সে কি! এই কেসে আপনাকে—”

“মিঃ ম্যাডান, আমি ডিটেকটিভ নই।” বলে কর্নেল হালদারমশাইকে দেখিয়ে দিলেন। “উনি ডিটেকটিভ। কী হালদারমশাই, কেস নেবেন নাকি?”

হালদারমশাই হাসতে গিয়ে গম্ভীর হলেন। ম্যাডান বললেন, “কর্নেল-সাহেব! আমি কিন্তু আপনার কাছেই এসেছি। দয়া করে আপনি কেসটা নিন। আমার বিশ্বাস, আপনিই পবিত্র হিরে উদ্ধার করে দিতে পারবেন।”

কর্নেল চোখ বৃজে দাঁড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। কোনও কথা বললেন না।

ম্যাডানসাহেব দ্বিধার সঙ্গে বললেন, “দয়া করে যদি আমার সঙ্গে আসেন, আমার বাড়ির গোপন বেসমেন্ট এবং ভল্ট দেখাতে পারি। আমার মনে হচ্ছে, আপনার দেখা দরকার।”

কর্নেল বললেন, “আপতাত দরকার দেখছি না।”

“তা হলে আপনি কেস নিচ্ছেন না?”

“আপনি কবে ফিরছেন বাইরে থেকে?”

“আগামী রবিবার।”

“ফিরে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।”

ম্যাডানসাহেব গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন। “ক্যাসটা লইলেন না কর্নেলসার? প্রচুর রহস্য! প্রচুর।”

“তার চেয়ে সাংঘাতিক রহস্যের খবর আপনি এনেছেন।” বলে কর্নেল টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে লাগলেন। একটু পরে কাকে বললেন, সোমা নাকি? আমি কর্নেল—না! না! শোনো! গত রাতে যশোর রোডে একটা আকসিডেন্ট—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ইন্টারেস্টেড। পরিচয় পাওয়া গেছে? এক সেকেন্ড। লিখে নিচ্ছি।” কর্নেল টেবিলে রাখা প্যাড টেনে কী সব লিখে নিলেন। চাপা দুর্বোধ্য কিছু কথাবার্তাও বললেন।

হালদারমশাই বললেন, “কী? কী?”

কর্নেল একটু হেসে বললেন, “ম্যাডানসাহেবের হঠাৎ এতদিন পরে আমার কাছে আসার কারণ খুঁজছিলাম, হালদারমশাই! আমার যখনই সন্দেহ হয়, কেউ কোনও তথ্য গোপন করে আমার সাহায্য চাইছে, তখন তার কেস নেওয়া

‘আমি পছন্দ করি না। গত রাতে আপনার দেখা ভুতটা যাকে আছাড়ে মেরেছে, তার নাম জামসিদ নওরোজি।’

চমকে উঠে বললাম, “পারসি নাম!”

“হ্যাঁ। তার চেয়ে বড় কথা, ভদ্রলোকের একটা কিউরিও শপ আছে। প্রকল্পবোয় দোকান।” বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। “আবার তাঁর দোকানটাও ম্যাডান জুয়েলাসের ওপরতলায়। কাজেই চলুন হালদারমশাই, সেই ভুতের আখড়াটি দেখে আসা যাক। জয়ন্ত! তুমিও চলো তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য কয়েক কিশি লোভনীয় খাদ্য পেয়ে যাবে!”

। ২ ।

প্রথমে চোখে পড়ল জংখরা ছোট্ট গেটের পাশে সাঁটা একটুকরো চৌকো ফলক। তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে : Human Genome Research Centre.

দোতলা বাড়িটা সত্যিই হানাবাড়ি। গেটে তালো বন্ধ। ভেতরে আগাছার জঙ্গল। চারদিকে দেওয়ালঘেরা এই বাড়ীর অবস্থাও জরাজীর্ণ। পলস্তারা খসে গেছে কোথাও-কোথাও। কার্নিসে গাছ গজিয়ে আছে। পদুরনো আমলের বাগানবাড়ি হতে পারে। ডাইনে বিশাল এলাকা জুড়ে কী কারখানা গড়া হচ্ছে। বাঁ দিকে একফালি খোয়াবিছানো রাস্তা এবং নতুন-পদুরনোয় ঘেঁষাঘেঁষি অনেক বাড়ি। একটাতে ঘন গাছপালা। হঠাৎ করে মনে হয় গ্রাম শহরে মেশানো কোনও মফস্বল জনপদ।

কর্নেল বাইনোকুলারে গেট থেকে ভেতরটা দেখছিলেন। বললাম, “এ কিসের গবেষণাকেন্দ্র?”

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, “জেনেটিক্সের।”

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন, “কী? কী?”

জবাব না দিয়ে কর্নেল ফুটপাথ ধরে এগিয়ে গেলেন একটা পান-সিগারেটের দোকানের দিকে। হালদারমশাই আমার দিকে তাকালেন। বললাম, “জেনেটিক্স ব্যাপারটা আমিও বুঝি না হালদারমশাই। শুধু এটুকু বলতে পারি, এখানে সম্ভবত কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র গড়া হবে। তাই আগেভাগেই ফলক সৈঁটে দিয়েছে।”

“গভমেন্টের কারবার! দেখি, নস্য পাই নাকি।” বলে হালদারমশাইও সেই দোকানটার দিকে হস্তদন্ত এগিয়ে গেলেন।

আমি আমার ক্রিমরঙা মারুতি গাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম। এভাবে একানড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। পড়োঁছ দ্দ-দ্দ’জন ছিটছস্তের পাল্লায়।



বরাতে কী আছে কে জানে। বসে থাকতে-থাকতে গেটের ভেতর দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালাম। সেইসময় হঠাৎ দোতলার একটা জানালা খুলে গেল এবং একটা মুখ দেখলাম।

নাহ্। ভূতের মুখ বলে মনে হল না। গোলগাল অমায়িক এবং বেশ সভ্যভাব্য মানুষের মুখ। আপনমনে হাসছেন তিনি। উৎসাহে গাড়ি থেকে নেমে ওঁকে ডাকব ভাবছি, হঠাৎ জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। তা হলে বাড়িটাতে এখন কেউ আছেন। কিন্তু বাইরের থেকে গেটে তালা কেন? খটকা লাগল।

কর্নেল এবং হালদারমশাই ফিরে এলে কথাটা বললাম। কর্নেল বললেন, “হ্যাঁ, তুমি বসন্তবাবুকে দেখেছ। শুনলাম ভুল্ললোক বন্ধ পাগল। তাই ওঁর ছোটভাই রাজেনবাবু ওঁকে বাড়িতে আটকে রেখে বাইরে যান। রাজেন অধিকারী নাকি বাঙ্গালোর কী চাকরি করতেন। সম্প্রতি এই পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছেন।”

হালদারমশাই ততক্ষণে গেটের কাছে হেঁড়ে গলায় ডাকাডাকি শুনতে শুনেছেন, “বসন্তবাবু! বসন্তবাবু! মিঃ অধিকারী।”

কর্নেল বললেন, “হালদারমশাই। বসন্তবাবুকে ডেকে লাভ নেই। তা ছাড়া পাগলের পাল্লায় পড়া কাজের কথা নয়। আসুন আমরা একবার এক-জায়গায় যাব।”

হালদারমশাই চাপা গলায় বললেন, “কর্নেলসাব, এই চান্স। ছাড়া ঠিক নয়। কাল রাত্তিরে যা স্বচক্ষে দেখেছি, তার তদন্ত করা দরকার।”

“আপনি তা হলে তদন্ত করুন। আমরা চাঁল।”

হালদারমশাই কান করলেন না। গেটের গ্রিলের খাঁজে পা রেখে উঠে গেট পেরিয়ে গেলেন। বললাম, “সর্বনাশ। হালদারমশাই করছেন কী।”

কর্নেল গাড়িতে ঢুকে বললেন, “ওঁর কাজ উনি করুন। গাড়ি ঘোরাও। আমরা এবার যাব চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ি।”

“বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত?”

কর্নেল হাসলেন। “হ্যাঁ ডার্লিং। এই হিউম্যান জেনোম ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।”

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আমাদের অনেক বছরের পরিচয়। উনি থাকেন এখান থেকে এক কিমি উত্তরে একটা প্রত্যন্ত এলাকায়। সদর রাস্তা থেকে আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ঢুকে আরও জঙ্গলে এলাকায় ওঁর ডেরা। নিরিবিবিলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত জায়গা। ওঁর একটি রোবট আছে। তার নাম ‘ধুন্ধুমার’। ডাকনাম ‘ধুন্ধু’। এই বিকট নামের কারণ আছে। শব্দটি উচ্চারণ করলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তা রোবটটিকে নাকি সক্রিয় করে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মনুষ্যাকৃতি রোবটটিকে সৌনিক রোবট বলা চলে।



তবে ধূন্দুকে আমার বস্তু ভুল করে। স্বপ্নমানুষ আর পোষা বাঘ প্রায় একই জিনিস।

গাড়ির হর্ন দিতেই অটোমেটিক গেট খুলে গেল। বিজ্ঞানী প্রবরকে সহাস্যে এগিয়ে আসতে দেখলাম। চিবুকে তে কোনো দাড়ি, একরাশ আইনস্টাইনি চুল। বেঁটেখাটো মানুষটি বড়ই সদালাপী। কর্নেল এবং আমার সঙ্গে কড়া হ্যান্ডশেক করে ডুইংরুমে ঢোকালেন। ধূন্দুকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আরও নিশ্চিন্ত হলাম শুনে যে, ধূন্দুর কী ভাইরাসঘটিত অসুখ হয়েছে। ল্যাবে তার চিকিৎসা চলেছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, “আজকাল আর সিস্থেটিক কফি খাই না। ন্যাচারাল কফি খাওয়াচ্ছি।”

কর্নেল বললেন, “কফি পরে হবে। আগে কাজের কথা সেরে নিই।”

“বলুন! এ বেলা আমার হাতে অটেল সময়।”

“হিউম্যান জেনোম সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।”

বিজ্ঞানী ভুরু কুঁচকে তাকালেন। “জেনোম? আপনি কি জেমস ডি ওয়াটসনের তত্ত্বের কথা বলেছেন? নোবেল-লরিয়েট ওয়াটসন?”

“হ্যাঁ। ওঁর হিউম্যান জেনোম প্রজেক্টের কথা শুনেছি।”

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। “আমি জ্যোতিষপদার্থবিজ্ঞানের কারবারি। তবে ইদানীং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমার লাইন জেনেটিক্সের কাছাকাছি এসে পড়ছে। তো জেনোম প্রজেক্ট! মানুষের প্রতি দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম আছে। ক্রোমোসোমের মধ্যে আছে মালার মতো সাজানো অসংখ্য জিন। সঠিক হিসাব এখনও করা যায়নি। ওয়াটসনের মতে, একজন মানুষের দেহে ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ জিন আছে। প্রতিটি জিনে আছে তিনশো কোটি ডি এন এ। এই ডি এন এ-র মধ্যে সঞ্চেতে লোকনো আছে মানুষের বংশগত বহু লক্ষণ বা চরিত্র। ওয়াটসন ডি এন এ-র গঠন খুঁজে সেই সংকেতগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। সেটাই ওঁর জেনোম প্রকল্প।”

“জেনোমতত্ত্ব কেউ কি এ-পর্যন্ত বাস্তবে কাজে লাগাতে পেরেছেন?”

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, “নাহ্। শ্রেফ তত্ত্ব। তবে স্বয়ং ওয়াটসনেরই মতে, একে কাজে লাগিয়ে বড়জোর বংশানুক্রমিক আদিব্যাপ্তি নির্মূল করা যায়। এই পর্যন্তই।”

“এর অপব্যবহার করা কি সম্ভব?”

“বাস্তবে কাজে লাগাতে পারলে অপব্যবহার সম্ভব বই কী।”

“কী ধরনের অপব্যবহার?”

চন্দ্রকান্ত খিঁক-খিঁক করে খুব হাসলেন। “সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করা যায়। শরীরের গড়ন বদলে দেওয়া যায়। তবে তার জন্য জেনোমের দরকার কী?

সেটা স্বেচ্ছা কিছু খাইয়ে বা অপারেশন করেও করা যায় ! মোট কথা, তত্ত্বটা এখনও নিছক তত্ত্বই ।

“এ-শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটেন-আমেরিকায় জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য জেনেটিক্সের ‘ইউজেনিক’ তত্ত্ব নিয়ে খুব হইচই বেঁধেছিল । নাৎসি জার্মানিতে ইউজেনিক তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ ইহুদি-হত্যার কারণ হয়েছিল । বিজ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক বিপজ্জনক । ইদানিং দেখছি, জেনেটিক্সের নানা তত্ত্বের উদ্ভট-উদ্ভট ব্যাখ্যা শুরুর হয়েছে ।”

কর্নেল চুরট জেলে বললেন, “জেনোম প্রকল্পের সাহায্যে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করা সম্ভব ?”

চন্দ্রকান্ত আবার ভুরু কুঁচকে তাকালেন । তারপর ফিক করে হাসলেন । “বহুবছর আগে নোবেলজয়ী আণবিক জীববিজ্ঞানী জাক মোদে বলেছিলেন, ল্যাবে মানুষ গড়ে ফেলবেন । ফুঃ ! মানুষ ইজ মানুষ ।”

“কৃত্রিম ডি এন এ অণু তৈরি কি সম্ভব ?”

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে বললেন, “আপনার পয়েন্টটা কী ?”

“এই এলাকায় একটি হিউম্যান জেনোম রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়েছে বা হবে জানেন ?”

চন্দ্রকান্ত ভূঁড়ি নাচিয়ে আর-এক দফা হাসলেন । “আপনি নিশ্চয় রাজেন অধিকারীর কথা বলছেন ? আমেরিকার কোনও ইউনিভার্সিটিতে জেনেটিক্স বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন ভদ্রলোক । শুনছি মাত্র । আলাপ হয়নি । এ-ও শুনছি, ভালমানুষ দাদার ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তাঁকে পাগল করে ফেলেছেন । কিন্তু ব্যাপারটা কী ?”

কর্নেল আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, “আমি আপনার সাহায্য চাই চন্দ্রকান্তবাবু !”

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চিবুকের তেকোনা দাঁড়ি চুলকোচ্ছিলেন । এটা ঠাঁর চিন্তাভাবনার লক্ষণ । একটু পরে বললেন, “হালদারমশাইয়ের দেখা প্রথম ঘটনাটা, মানে পার্শিস ভদ্রলোককে তুলে আছাড় মারাটা চিন্তাযোগ্য বিষয় । কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটা ঠাঁর দেখার ভুল হতেও পারে । মানে, চোখ উপড়ে বসিনে ধোওয়া এবং রক্ত ! তারপর সেই চোখ থেকে গুলি বের করা । হালদার-মশাইকে তো বিলক্ষণ জানি !”

বলে চন্দ্রকান্ত হেসে উঠলেন । বললাম, “গুলির শব্দ শুনছিলেন হালদারমশাই ! ঘটনাস্থলে পাওয়া রিভলভারটা তার প্রমাণ ।”

“গুলিটা নকল পাথরে চোখে লেগেছিল ।” চন্দ্রকান্ত আবার দাঁড়ি চুলকোতে থাকলেন । “বাই হোক, লোকটার গায়ের জোরই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে ।”

কর্নেল চোখ বন্ধে চুরট টানছিলেন। কোনও কথা বললেন না। আমি বললাম, “আপনি বিজ্ঞানী। এ-যুগে ফ্ল্যাঙ্কেনস্টাইন-কাহিনী কি বাস্তবে সম্ভব নয়? আপনিই বললেন, জেনোমতত্ত্ব কাজে লাগিয়ে শরীরের গড়ন বদলানো যায়। শারীরিক শক্তিও তা হলে বদলানো যায়?”

চন্দ্রকান্ত বললেন, “তা যায়। তবে—”

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, “আপনার যুৎসুদুয়ার যন্ত্রমানুষ মাত্র। কিন্তু কৃত্রিম চামড়া, কৃত্রিম পেশি-শিরা-উপশিরা, কৃত্রিম স্নায়ুপিণ্ড-হৃৎস্পন্দন এবং কৃত্রিম রক্ত তো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এ-যুগে। বাকি রইল কৃত্রিম মগজ। কোনও বিজ্ঞানী কি এইসব জুড়ে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করতে পারেন না?”

“পারেন, স্বীকার করছি। কিন্তু সেই কৃত্রিম মানুষও আসলে রোবট ছাড়া কিছু নয়। কারণ, তার কৃত্রিম মগজ মানুষের মগজের মতো স্বাধীন চিন্তা করতে পারবে না। যে তাকে তৈরি করেছে, তারই চিন্তাভাবনা বা ইচ্ছা তাকে কন্ট্রোল করবে।”

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। “তা হলে তাকে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে চালানো যাবে।”

“ঠিক। একশোভাগ ঠিক।” চন্দ্রকান্ত চাপাশ্বরে বললেন, “এখন কথা হচ্ছে, রাজেন অধিকারী তা করতে পেরেছেন কি না।”

আমি না বলে পারলাম না, “ম্যাডানসায়েবের হিরে ছুরি তা হলে রাজেন-বাবুরই কীর্তি। জেনোম রিসার্চের জন্য প্রচুর টাকার দরকার। হিরেটার দাম এ-বাজারে প্রায় দেড় কোটি টাকা।”

কর্নেল অটুহাসি হাসলেন। “জয়ন্ত খাঁটি সাংবাদিক হতে পারল না বলে ওর সমালোচনা করি বটে, তবে ওর মধ্যে সাংবাদিক সুলভ চটজলদি সিদ্ধান্ত করার স্বভাব আছে। ডার্লিং! তোমাকে বারবার বলেছি, বাইরে থেকে যা যেমনটি দেখাচ্ছে, ভেতরে তা তেমনটি নয়।”

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। “চলুন না, রাজেন অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করে আসি। যদি উনি এতক্ষণ না ফিরে থাকেন, আমি এম পি ডি দিয়ে বাইরে থেকে কিছু ডেটা সংগ্রহ করে নেব।”

বললাম, “এম পি ডি মানে?”

“ম্যাগ্‌নেটপ্যারপাস ডিটেক্টর। আমারই আবিষ্কার।” চন্দ্রকান্ত সগর্বে বললেন। ওঁর বাড়ির ভেতর কী কাজকর্ম হয়, তার হৃদিস পেয়ে যাব।”

কর্নেলও উঠলেন। বললেন, “আমার ভয় হচ্ছে, হালদারমশাই কোনও কলেঙ্কারি না বাঁধান। একগুঁয়ে মানুষ। আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড। আবার ওই জিনিষটাই তাঁকে বিপদে ফেলে। অন্তত তাঁর অবস্থা জানার জন্যও আমাদের

ওখানে আবার যাওয়া দরকার মনে হচ্ছে ।”

বিজ্ঞানী নিজের গাড়ী বের করলেন । ঠুঁর গাড়ি আগে, আমাদেরটা পেছনে । বিজ্ঞানীর গাড়ি বলে কথা ! সদর রাস্তায় পৌঁছে রকেটের বেগে উধাও হয়ে গেল । বললাম, “কী অশুভত মানুষ !”

কর্নেল হেসে বললেন, “সম্ভবত আমরা আরও অশুভত মানুষের পাল্লায় পড়তে চলছি ডার্লিং ।”

“আপনি কি কৃত্রিম মানুষের কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন—মানে যাকে গত রাতে হালদারমশাই দেখেছেন ?”

“নিছক একটা থিওরি, জয়ন্ত ।” বলে কর্নেল বাইনোকুলার তুলে রাস্তার ধারের গাছে হয়তো পাখি খুঁজতে থাকলেন ।

সেই বাড়িটার কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম । বিজ্ঞানীপ্রবরের গাড়িটা খুঁজে পেলাম না । বললাম, “সর্বনাশ । চন্দ্রকান্তবাবুকে কৃত্রিম মানুষ হাণ্ডিক করে দেয়নি তো ?”

কর্নেল গাড়ি থেকে বেরিয়ে বললেন, “চন্দ্রকান্তবাবুর অভ্যাস খোদার ওপর খোদাকারী করা । ন্যাচারাল কফির বদলে সিন্থেটিক কফি খান । থিদে পেলে নাকি এনার্জি ক্যাপসুল খান । কৃত্রিম অর্থাৎ ঠুঁর ভাষায় সিন্থেটিক মানুষের প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক । যাই হোক, গেটের দরজায় আর তালা আঁটা নেই । হুঁ, ওই দ্যাখো ঠুঁর গাড়ি !”

বলে কর্নেল গেট ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে গেলেন ! আমি গাড়ি ঢোকাতে সাহস পেলাম না । বেরিয়ে গিয়ে ঠুঁকে অনুসরণ করলাম ।

এবড়োখেবড়ো থোয়া-ঢাকা রাস্তা । দূঁধারে বিচ্ছিন্ন জঙ্গল । বাড়িটার সামনে চন্দ্রকান্তের গাড়ি দাঁড় করানো । আমরা সেখানে যেতেই তাঁর সাড়া পাওয়া গেল ঘরের ভেতর থেকে । “চলে আসুন কর্নেল !”

সেকেলে হলধর বললেই চলে । ঝাড়বাতিও আছে । পদ্রনো আসবাবপত্রে সাজানো বনেদি পরিবারের বৈঠকখানা । চন্দ্রকান্ত আলাপ করিয়ে দিলেন রাজেন অধিকারীর সঙ্গে । রাজেনবাবুর বয়স আন্দাজ ষাটের কাছাকাছি । রোগা হাড়িগলে চেহারা । পরনে গলাবন্ধ কোট আর ঢোলা পাতলদুন । মাথায় কাঁচাপাকা সন্মোসিচুল । চোখে পদ্রু লেন্সের চশমা । কেমন ভুতুড়ে চেহারা যেন ।

তবে হাসিটি অমায়িক এবং হাবভাবেও বড় বিনয়ী । শশব্যস্তে অভ্যর্থনা করে আমাদের বসালেন । বললেন, “হিউম্যান জেনোম রিসার্চ সেন্টার সম্পর্কে ক্রমশ আপনাদের মতো বিশিষ্ট মানুষদের আগ্রহ জাগাতে পেরেছি, এ আমার সৌভাগ্য । দেশে ফিরে আসার পর বিজ্ঞানী মহলে শূদ্র বাঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম । এখন দেখছি, সমঝদার বিজ্ঞ মানুষেরও অভাব নেই ।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিঃ পদার্থবিদ মিঃ চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকেও আমি আকর্ষণ করতে পেরেছি ।”

চন্দ্রকান্ত সহাস্যে বললেন, “এবং একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানীকেও ! উনি কর্নেলের দিকে আঙুল তুললেন ।

কর্নেল বললেন, “এবং একজন নামকরা সাংবাদিককেও !” কর্নেল আমার দিকে তাকালেন । ঠোঁটের কোনায় দৃশু হাঁসি ।

রাজেনবাবু বললেন, “জয়ন্তবাবু ! আমার এই প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু লিখুন । এদেশে এই প্রথম বেসরকারী উদ্যোগে জেনোম প্রজেক্ট । গভর্নমেন্ট মানেই আমলাতন্ত্র । কিন্তু সরকারী বিজ্ঞানীদের আমলাতন্ত্র আরও সাম্রাজ্যিক । বলে, টাকা দিচ্ছি । তবে বোর্ড গড়তে হবে । তাতে ঊঁরা থাকবেন । বন্ধুণ ব্যাপার ! লাল ফিতের ফাঁসে দম আটকে শেষে আমিই মারা পড়ব ।”

কর্নেল বললেন, “আপনার ল্যাব আছে নিশ্চয় ?”

“আছে— মানে, সব গড়তে শুরুর করেছে ।”

“জয়ন্তকে আপনার ল্যাব দেখিয়ে ব্যাপারটা বদ্বিষ্মে বলুন । তা হলে ও সেইভাবে কাগজে লিখবে । আর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লেখা মানেই প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি ।”

“জানি, জানি ।” বলে উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন রাজেন অধিকারী । “আসুন আপনারাও আসুন !”

ল্যাবরেটরী মানেই বিদ্যুৎঘটে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক জিনিসপত্র, নানারকম গন্ধ । তার সঙ্গে একালে হরেক সাইজের কম্পিউটার এবং ভিশনস্ক্রিন যুক্ত হয়েছে । তা চন্দ্রকান্তের ল্যাব এবং রাজেনবাবুর ল্যাবের মধ্যে একটাই ফারাক চোখে পড়ল । জারে রঙিন তরল পদার্থে চুবানো ইঁদুর, আরশোলা টিকিটিকি ইত্যাদ সরীসৃপ-পোকামাকড় । তারপর আঁতকে উঠলাম দেখে, কবজি থেকে কাটা একটা হাত । মানুষের হাত । আমার চমক লক্ষ্য করে রাজেনবাবু বললেন, “হাসপাতালের মর্গ থেকে জোগাড় করেছে । এবার জেনোম ব্যাপার বদ্বিষ্মে বলি ।”

আমার পকেটে রিপোর্টারস নোটবই সবসময় থাকে । উনি বকবক শুরুর করলে আমি নোট নেওয়ার ভান করে যা খুঁশি লিখতে থাকলাম । চন্দ্রকান্ত একটা কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকে আছেন দেখলাম । কিন্তু কর্নেল কোথায় গেলেন ?

প্রায় আধ ঘণ্টা টানা বকবক করে এবং এটা-ওটা দেখিয়ে রাজেন অধিকারী শখন থামলেন, তখন আড়চোখে তাকিয়ে কর্নেলকে ঢুকতে দেখলাম ।

একটু পরে আমাদের বিদায় দিতে গেট পর্যন্ত এলেন রাজেন অধিকারী বললেন, “আপনাদের জন্য সব সময় দরজা খোলা।”

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত কেন কে জানে, একটি কথাও না বলে তাঁর গাড়ি নিয়ে আগের মতোই উধাও হয়ে গেলেন। আমরা এগোলাম ভি আই পি রোডের দিকে। যেতে-যেতে বললাম, “গোপন তদন্তের ফল বলতে আপত্তি আছে?”

কর্নেল হাসলেন, “বন্দি হালদারমশাইকে উদ্ধার করতে পেরেছি। তিনি ভোঁ-কাট করেছেন।”

চমকে উঠে বললাম, “অঁ্যা?”

কর্নেল শূদ্ধ বললেন, “হঁ্যা।”

॥ ৩ ॥

কোনও গুরুতর চিন্তাভাবনার সময় আমার বন্ধ বন্ধুটির চোখ বন্ধ হয়ে যায়। ডাকলেও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা তখনকার মতো জানা গেল না। শূদ্ধ ভাবছিলাম, জারে চুবানো সেই কাটা হাতটার কথা এবং শিউরে উঠছিলাম। হালদারমশাই জোর বাঁচা বেঁচেছেন তা হলে। আমরা পেঁছতে দেরি করলে গোয়েন্দা ভদ্রলোককে নিশ্চয় কুচিকুচি করে কেটে ‘জেনোমবিজ্ঞানী’ রাজেন অধিকারী জারে চুবিয়ে রাখতেন।

“কর্নেলের বাড়ির লনে গাড়ি ঢুকিয়ে দেখি, উনি তখনও ধ্যানস্থ। বললাম, “এসে গেছি বস্।”

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, “কখনও কানমলা খেয়েছ, ডার্লিং?”

হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রশ্নে ভাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, “কানমলা? তার মানে?”

“নিশ্চয় খেয়েছ। বিশেষ করে তোমার ছেলেবেলা পাড়াগাঁয়ে কেটেছে যখন।” কর্নেল আশ্বে-সুস্থ গাড়ি থেকে বেরোলেন। একটু হেসে বললেন, “কানমলা খাওয়া খুব অপমানজনক ব্যাপার। কাউকে চড়াও অপমান করতে হলে কানমলে দেওয়াই যথেষ্ট। কারও কান ধরলেই সে জন্ম হয়। শূদ্ধ মানুুষ নয় জয়ন্ত! জন্তু-জানোয়ারও কান ধরলে জন্ম।”

“ব্যাপারটা কী?”

“তুমি কি গাড়িতেই বসে থাকবে, না কি বেরোবে?”

ঘাড় দেখে বললাম, “বারোটা বাজে। প্রেস ক্লাবে লাক্সের নেমন্তন্ন আছে। এক মন্ত্রী ভাষণ দিতে আসবেন।”

“ঠিক আছে। তা হলে তুমি এসো।” বলে কর্নেল চলে গেলেন।

একটু অভিমান নিশ্চয় হল। হালদারমশাইয়ের “বন্দি হওয়া” এবং ‘কানমলা’ ব্যাপারটা জানার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এই খেয়ালি বন্ধুর রকমসকম বরাবর

দেখে আসছি। যথাসময়ে নিজে থেকেই জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কাজেই গাড়ি ঘুরিয়েই তখনই স্থানত্যাগ করলাম।

সন্দের দিকে একবার ভেবেছিলাম কর্নেলের বাড়ি যাব! কিন্তু উনি যখন-তখন হুট করে বেরিয়ে নিপাত্তা হয়ে যান। তাই টেলিফোন করলাম। ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। এককথায় জানিয়ে দিল, “বাবামশাই বেইরেছেন।”

হালদারমশাইয়ের ফ্ল্যাটে রিং করলাম। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে রিং করলাম। ফোনে তখনই সাড়া এল, “জয়ন্তবাবু নাকি?”

অবাক হয়ে বললাম, “গলা শব্দেই লোক চেনার যন্ত্র তৈরি করেছেন বোঝা যাচ্ছে।”

“ঠিক তাই।” বিজ্ঞানীর হাসি ভেসে এল। “আমার সোনিম থিওরি..”

ঝটপট বললাম, “জেনোম থিওরির পর সোনিম থিওরি এলে আমার বারোটা বেজে যাবে চন্দ্রকান্তবাবু! প্লিজ! থিওরি থাক।”

“সহজ ব্যাপার জয়ন্তবাবু! ইংরেজিতে এস ও এন আই এম সোনিম। শব্দ! ধনি! বুঝলেন তো?”

“চন্দ্রকান্তবাবু—”

“ল্যাভে বসে আছি, জয়ন্তবাবু! আমার ঘরে যাঁরা আসেন, তাঁদের গলার স্বর, শব্দ উচ্চারণের বিশেষ-বিশেষ ভঙ্গি ইত্যাদি সব রেকর্ড করে রাখি। কম্পিউটারে সেই ডেটা অ্যানালিসিস করে নিই। তারপর টেলিফোনের সঙ্গে কম্পিউটারের কানেকশন! ব্যস! সো ইজি।”

“প্লিজ! আমি জানতে চাইছি আপনার সেই মার্টিপারপাস ডিটেক্টর যন্ত্রে রাজেনবাবুর বাড়ি সম্পর্কে কী তথ্য পেলেন?”

“ডেটা অ্যানালিসিস চলছে। এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। আরও দু-একটা দিন লেগে যাবে হয়তো।”

“কৃত্রিম মানুষের কোনও হৃদিস পেলেন কি?”

“নাহ্। তবে একটা অদ্ভুত ধ্বনিরঙ্গ ধরা পড়েছে। কোনও পার্থিব বস্তু বা প্রাণী এই ধ্বনিরঙ্গের কারণ নয়, এটুকু বলতে পারি।”

“চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি তো হালদারমশাইকে ভালই চেনেন।”

“খুঁউব চিনি।”

“রাজেনবাবুর বাড়ি ঢুকে উনি বিপদে পড়েছিলেন। আমরা যখন গুঁর ল্যাভে ছিলাম, তখন কর্নেল গুঁকে দেখতে পান। বন্দি অবস্থায় ছিলেন। কর্নেল গুঁকে উদ্ধার করেন।”

“হাঃ হাঃ হাঃ! কর্নেল আমার পাশেই বসে আছেন। কথা বলুন।”

কর্নেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। “ডার্লিং! তখন যে কথাটা তোমাকে

বোঝাতে চেয়েছিলাম, আবার বদ্বতে চেষ্টা করো। কানমলা! প্রতিপক্ষকে জয় করতে হলে তার কান ধরে ফেলাবে। কেমন? যখনই কেউ তোমার ওপর হামলা করবে, তোমার লক্ষ্য হবে তার কান। ভুলো না কিন্তু।”

চটে গিয়ে বললাম, “এই নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করছি—”

“নাক নয়, কান। তুমি কানমলে প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারটা লক্ষ্য করো, জয়ন্ত। তা হলেই বদ্বতে পারবে, কান একটা ভাইটাল প্রত্যঙ্গ। মানদ্য শব্দ নাকমলে প্রতিজ্ঞা করে না, কানও মলতে হয়। তবে নাহ্। নিজের কান নিজে মলে নিজেকে জয় করার অর্থ হয় না।”

“ছাড়ছি।”

“কান ধরে আছ নাকি?”

“নাহ্। ফোন।”

“ফোনের সঙ্গে কানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ডার্লিং! ফোন মানে ধনি। ধনি আমরা কান দিয়েই শুন।”

খাপা হয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। ঠিক করলাম, এসব উদ্ভূটে ব্যাপারে কিছুতেই নাক গলাব না। এমনকী, ওই ‘বদ্ব শব্দ’র মদ্বদর্শনও আর করব না।

পরদিন বিকেলে পত্রিকা-অফিসে রাজেন অধিকারীর টেলিফোন পেলাম। রাজেনবাবু বললেন, “মিঃ জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

“জয়ন্ত চৌধুরী বলছি।”

“মিঃ চৌধুরী! খবরটা তো বেরোল না আপনাদের কাগজে? খুব আশা করে ছিলাম।”

“বেরোবে। আসলে আমাদের কাগজে বিস্তাপনের চাপ খুব বেশি তো! সবসময় সব খবরকে জায়গা দেওয়া যায় না।”

“শুনুন! ব্যাপারটা স্যারেন্টিফিক কিনা! কাজেই জটিল। আপনার লেখার সুবিধে হবে বলে আমি একটা আর্টিক্ল-আকারে লিখে লোক দিয়ে পাঠাব কি?”

“পাঠাতে পারেন। কিন্তু এখনই আমাকে রাইটাস বিল্ডিংয়ে যেতে হবে। ফিরতে দেরি হতে পারে। নীচের রিসেপশনে দিয়ে যেতে বলবেন আপনার লোককে।”

“না জয়ন্তবাবু! ওটা আপনার হাতেই সরাসরি পৌঁছানো দরকার। কারণ এর আগে আমি সব কাগজে রাইট-আপ পাঠিয়েছি। ছাপা হয়নি। প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি। কেউ আসেনি। আমাকে আসলে কেউ পাত্তা দিতে চায় না। হ্যাঁ, ছোটখাটো কাগজ ছেপেছে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। হয় না। বড় কাগজে বেরোলে লক্ষ লক্ষ লোকের নজরে পড়ে।”

“বুঝেছি। আপনি এক কাজ করুন। খামে আমার নাম লিখে পাঠান। তা হলেই আমি পেয়ে যাব।”

“ঠিক আছে। আসলে আমি আজই ক’দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। তাই এত তাড়া।”

“এক মিনিট মিঃ অধিকারী! কাল সকালে কি আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল? হ্যালা! হ্যালা! হ্যালা!”

একটু পরে সাড়া এল। “ঢুকেছিল। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?”

“রিপোর্টারদের খবরের সোর্স বলা বারণ। হ্যালা! হ্যালা! হ্যালা!”

লাইন কেটে গেল। বুদ্ধলাম, বোকামি করে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাইকে ফোন করলাম। রিং হতে থাকল। কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। টেলিফোনের গাউগোল অথবা হালদারমশাই কোথাও পাড়ি জমিয়েছেন। ভদ্রলোক রহস্য-অন্ত-প্রাণ যাকে বলে। হয়তো ইয়াজ্জদাগিদের হিরের খোঁজেই হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাত দশটায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম প্রতিদিনের মতো। রাজেন অধিকারীর কোনও রাইট-আপ বা আর্টিকল কেউ রিসেপশনে জমা দিয়ে যায়নি। সত্যি, মদুখ ফসকে কথাটা বলা বোকামি হয়েছে। লোকটা সতর্ক হয়ে গেছে।

সল্ট লেকে নতুন কেনা ফ্ল্যাটে মাসখানেক হল উঠেছি। রান্ধা খাঁ-খাঁ জনহীন। শীতের রাতে কুয়াশা জমে আছে গাছপালায়। হঠাৎ দেখি প্রায় তিরিশ মিনিটের দূরে একটা লোক রান্ধার মাঝখান দিয়ে আসছে। হন’ দিয়েও তাকে সরানো গেল না। পাগল-টাগল হবে। তাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে আবার সামনে এসে দাঁড়াল। দুটো ল্যাম্পপোস্টের মধ্যবর্তী জায়গা। দু’ধারে গাছ এবং ঝোপঝাড়। ব্রেক কবেই দেখি তার গায়ে নোভিল্লু সোয়েটার।

তারপর তার চেহারার দিকে চোখ গেল। ও কি মানদুষ? ও কী মানদুষ?

হালদারমশাইয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে আমার গাড়ির সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধলাম, গাড়িটা সে দুহাতে উলটে ফেলে দেওয়ার মতলব করছে।

এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অমনই সে আমার দিকে এগিয়ে এল। অতীত জলজ্বলে নীলচে চোখে হিংস্রতার ছাপ।

মুহূর্তে কনলৈর কথাটা মনে পড়ে গেল। আমাকে ধরার আগেই মরিয়া হয়ে আমি তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে তার কান দুটো ধরে মোচড় দিলাম। অমনই সে ধড়াস করে নোতিয়ে পড়ল। একেবারে চিংপাত।

এর পর আর নাভ’ ঠিক রইল না আমার। সটান গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

ফ্র্যাটে ফিরে প্রতিজ্ঞা ভুলে কর্নেলকে রিং করলাম। আমার হাত তখনও কাঁপছিল। কর্নেলের সাড়া পেয়েই বললাম, “এইমাত্র দারোয়ানটার পাল্লায় পড়েছিলাম। আপনার কথামতো—”

“কানমলে জন্ম করেছ তো?”

“হ্যাঁ। সাম্প্রতিক ব্যাপার। ভার্গিস আপনার পরামর্শটা মনে পড়েছিল। নইলে জামসিদ নওরোজির মতো হাড়গোড়-ভাঙা দলাপাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ে থাকতাম। শীতের রাতে সল্ট লেকের ব্যাপার তো জানেন। চের্চিয়ে মাথা ভাঙলেও কেউ বেরিয়ে আসত না।”

কর্নেলের হাসি শোনা গেল। বললেন, “ডার্লিং! তোমার ওপর তো রাজেনবাবুর রাগ হওয়ার কথা নয়। উনি কাগজে প্রচার চান।”

“আমারই বোকামি। উনি বিকেলে ফোন করেছিলেন।” বলে ঘটনাটা সবিস্তার জানিয়ে দিলাম।

কর্নেল বললেন, “হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বরাবরই বন্দী হন, সে তো জানো! এবারও মদুখে টেপ-সাঁটা অবস্থায় বাথরুমে বন্দী ছিলেন। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা ছিল। দরজায় পাহারা দাঁড়িয়ে তোমার দেখা দানো আমার ভাবায় কৃত্রিম মানদ্ব। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের সিন্থেটিক কফির মতো সিন্থেটিক ম্যানও বলতে পারো। তো তার পাল্লায় পড়ে আমারও বাঁচার কথা ছিল না। দৃশ্যটা কম্পনা করো জয়ন্ত! বাথরুম খোলা। হালদারমশাই পড়ে আছেন। দানোটা দরজার সামনে আমাকে দেখেই দু’হাত বাড়াল। জয়গাটা করিডরমতো। কয়েক হাত দূরে দোতলার সিঁড়ি। হঠাৎ দেখি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন এক ভদ্রলোক। মদুখে শিশুদর হাসি। দেখামাত্র বদ্বললাম রাজেনবাবুর দাদা সেই পাগল ভদ্রলোক। মিটিমিটি হেসে চোখ নাচিয়ে চাপা গলায় বললেন, “কান মলে দিন ব্যাটাচ্ছেলের! জন্ম হবে।” ব্যস! দানোটা হাত বাড়তেই আমি তার কান দুটো ধরে জোরে মলে দিলাম। কাজেই তোমাকে কান মলে দেওয়ার কথা বলে আসলে সতর্ক করেই দিয়েছিলাম।”

“থ্যাংকস্ বস্! কিন্তু কালই পদুলিশকে জানিয়ে দেননি কেন?”

“হালদারমশাই জানিয়েছিলেন। পদুলিশ গিয়ে কোনও হৃদিস পায়নি। মাঝখান থেকে হালদারমশাই পদুলিশের জেরায় জেরবার হয়েছেন।”

“উনি কোথায় আছেন? ফোনে পাচ্ছি না কাল থেকে।

“দমদমে ওঁর সেই আত্মীয়ের বাড়িতে আছেন। আসলে রাজেনবাবুর বাড়ির দিকে সারাঞ্চন নজর রাখার জন্য ওখানে ডেরা পেতেছেন।”

“আমার নার্ভ বিগড়ে গেছে, বস্! রাখছি।”

“সকালে চলে এসো। চন্দ্রকান্তবাবুর আসার কথা আছে।”

“যাব।”

ফোন রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম। কলকাতা মহানগরে এমন একটা সাংসাতিক বিপজ্জনক দানো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কি বিশ্বাস করতে চাইবে ?

সারাটা রাত প্রায় জেগেই কাটিয়েছিলাম। একটু শব্দ হলেই চমকে উঠি। ওই ভয়ঙ্কর দানোকে কোনও অস্ত্রেই জন্দ করা যাবে না। শব্দ কান মললেই ব্যাটাচ্ছেলে কাত। কাজেই যদি সে রাতবিরেতে হানা দেয়, তার কান মলে দেওয়ার জন্যই জেগে থাকা দরকার।

শেষ রাতে কখন একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেটা জেগে ওঠার পর বুঝলাম। নিজের ওপর চটে গেলাম। ভাগ্যিস দানোটা ওত পাততে আসেনি।

যখন কর্নেলের তেতলার অ্যাপার্টামেন্টে পৌঁছিলাম, তখন প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ভাষণ দিচ্ছেন এবং কর্নেল মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। ইশারায় আমাকে বসতে বললেন কর্নেল। ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল।

চন্দ্রকান্ত বলছিলেন, “ক্লোনিং আর জেনোম এক জিনিষ নয়। ক্লোনিং বলতে সাদা বাংলায় কলম করা। হাজার বছর আগেও মানুষ জেনেটিক্স না জেনেও ক্লোনিং করেছে। এক জাতের উদ্ভিদের সঙ্গে আর-এক জাতের উদ্ভিদ কিংবা এক জাতের প্রাণীর সঙ্গে আর এক জাতের প্রাণীর ক্লোনিং করেছে। কিন্তু আধুনিক জেনেটিক্সের থিওরির অপব্যাত্যা করে কেউ-কেউ বলছেন, দেহকোষের ডি এন এ অণুতে কারচুপি করে মানুষকে গাধা করা যায়। কিংবা ধরুন, একই মানুষের অসংখ্য আদল গড়া যায়। হুবহু তারা এক। এভাবে অসংখ্য কর্নেল কিংবা এই চন্দ্রকান্ত চৌধুরি বাজারে ছাড়া যায়। কিন্তু আমি বলব, এটা বাড়াবাড়ি। এটা শ্রেফ গল্প। বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান। মশাই, মানুষ ইজ মানুষ! জেনোম থিওরি কখনও দাবি করছে না, মানুষকে গাধা কিংবা দানো বানানো যায়।”

কর্নেল বললেন, “সিন্থেটিক ম্যানের ব্যাপারটা বলুন চন্দ্রকান্তবাবু!”

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। “রাজেন অধিকারীর বাড়িতে অশ্রুত ধর্মান্তরঙ্গ অ্যানা-লিলিস করে বুঝেছি, আমার তৈরি শ্রীমান ধুন্ধুর মতোই কোনও রোবোট আছে। কিন্তু সে-রোবোট ধুন্ধুর চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তার দেহ খাতু দিয়ে তৈরি নয়।”

“কৃত্রিম হাড়-মাংস-চামড়া দিয়ে তৈরি!”

“ঠিক, ঠিক।” চন্দ্রকান্ত নড়ে বসলেন। “কিন্তু ওইসব জিনিসকে একেবারে কৃত্রিম বলতে দ্বিধা হচ্ছে। সম্ভবত মৃত মানুষের দেহকোষের ডি এন এ অণুতে কোনও প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে হাড়-মাংস-রক্ত-চামড়া ইত্যাদি তৈরি

করেছেন রাজেন অধিকারী। তারপর জোড়া দিয়ে একটা মানদ্য গড়েছেন।”

“জেনোম প্রজেক্ট তা হলে সফল করতে পেরেছেন রাজেনবাবু?”

বিজ্ঞানী চিবুকের দাঁড়ি চুলকে বললেন, “সম্ভবত।”

আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, “কাল রাতে দানোটা আমাকে—”

হাত তুলে চন্দ্রকান্ত বললেন, “শুনছি। কিন্তু কান ধরলে কেন ও জন্ম হয় জানেন কি? আমার কাছে শুনুন। আপনাকে আমার ‘সোনিম’ থিওরির কথা বলছি। রাজেনবাবুর এই রোবোর্টটিও ধর্নিতরঙ্গের সাহায্যে চালিত হয়। কানই ধর্নিতরঙ্গের একমাত্র গমনপথ। কাজেই ওর কান চেপে ধরলে রাজেনবাবুর রিমোট কন্ট্রোল থেকে পাঠানো ধর্নিতরঙ্গ ওর রেনে ঢুকতে বাধা পায়। তখন স্বভাবত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।”

কর্নেল বললেন, “আমার ধারণা, ওর কানের সঙ্গেই কোনও স্ক্যান রিসিভিং যন্ত্র ফিট করা আছে। কানে চাপ পড়লে কিছুদ্ধগের জন্য সেটা অকেজো হয়ে যায়।”

বললাম, “রাজেনবাবুর দাদা বসন্তবাবু সেটা জানেন?”

“সেভাবে হোক, জানতে পেরেছেন।” বলে কর্নেল চুরট ধীরে চোখ বদ্বলেন।

“কিন্তু সম্রাট ইয়াজদারগিরদের হিরের কোনও খোঁজ পেলেন না চন্দ্রকান্তবাবু? আপনার ডিটেক্টরে কোনও খোঁজ মেলেনি?”

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, “নাহ্। রাজেনবাবুর বাড়িতে কোনও হিরে-টিরে নেই মশাই!”

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, “চন্দ্রকান্তবাবু! আপনার ওই যন্ত্রটি কতটা দূরত্বের পরিধি খুঁজতে পারে?”

“চারদিকে একশো মিটার পরিধির দূরত্ব খুঁজতে পারে।”

“ওপরের দিকে?”

“ভার্টিক্যালি?” চন্দ্রকান্ত একটু হাসলেন। “আমি হাত তুললে যতটা উঁচু হয়, ততদূর পর্যন্ত।”

“তার মানে দোতলার কিছুদ্ধ ডিটেক্ট করা যায় না আপনার যন্ত্রে?”

“নাহ্। আসলে রাজেনবাবুর বাড়িতে এম পি ডি আমার বুকপকেটে রাখাছিল। হাতে ওটা দেখলে ঠাণ্ডা সন্দেহ হত কি না বলুন?”

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে বললেন, “হ্যাঁ। কে? হালদারমশাই নাকি? কোথা থেকে বলছেন?...কী আশ্চর্য! ওখানে কেন গেলেন?...বলেন কী! কাকে দেখেছেন? বসন্তবাবুকে?...হ্যাঁ, প্রচুর রহস্য।... হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ওয়েট অ্যান্ড সি।...উইশ ইউ গুড লাক। রাখছি।”

কর্নেল ফোন রেখে প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপরে বললেন, “হালদারমশাই গোপালপদ্র-অন-সি থেকে ট্রান্সকল করে জানালেন, গত রাতে রাজেনবাবু এবং তাঁর দানোটিকে ফলো করে হাওড়া স্টেশনে যান। তখন রাত প্রায় এগারোট। মাদ্রাজ মেল ছাড়ার কথা রাত আটটা ৪৫ মিনিটে। আড়াই ঘণ্টা দৌঁতে ছাড়ে। গুঁর ধারণা, রাজেনবাবু সে-খবর জেনেই দৌঁর করে স্টেশনে যান। যাই হোক, গোয়েন্দামশাই গুঁদের ফলো করে গোপালপদ্র-অন-সি-তে পৌঁছেছেন। উঠেছেন আমার বন্ধু স্মিথসায়েবের ওশান হাউসে। দোতলার বারান্দা থেকে এক পলকের জন্য নাকি সামনে বালিয়াড়িতে একটা ভাঙা ঘরের ভেতর বসন্তবাবুকে দেখেছেন। নেমে গিয়ে তাঁর আর পাত্তা পান নি। এদিকে রাজেনবাবু উঠেছেন লাইটহাউসের ওঁদিকে ওয়েবের গ্র্যান্ডে। কাজেই—”

“গুঁর কথার ওপর বললাম, “প্রচুর রহস্য।”

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চোখ নাচিয়ে বললেন, “চলুন কর্নেল! গোপালপদ্র-অন-সি নিরিবিলি জায়গা। রাজেনবাবুর রোবোটটিকে জন্ম করে জেনোটিক্সের মিস্ট্রি সলভ করা যাবে। এই চান্স ছাড়া উচিত নয়।”

কর্নেল চোখবুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, “গেলে আপনাকে খবর দেব।”

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, “নওরোজি জানতে পেরেছিলেন, কে হিরে চুরি করেছে। তাই তাঁকে মরতে হল। এবার হালদারমশাইয়ের বরাতে সাংঘাতিক বিপদ ঘটে না যায়। আমাদের যাওয়া উচিত, কর্নেল।”

“হালদারমশাইকে কানমলার পরামর্শ দিয়েছি ডার্লিং! ভেবো না।”

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আমি কিন্তু যাচ্ছি। বিজ্ঞানের এমন রহস্যময় আবিষ্কার হাতে-নাতে যাচাইয়ের চান্স ছাড়তে রাজি নই কর্নেল! গোপালপদ্র উপকূলের মতো সুন্দরান নির্জন জায়গা ভারতের কোনও সমুদ্র-তীরে নেই। আমি রাজেনবাবুর অজ্ঞাতসারে রোবোটটর ওপর পরীক্ষা চালাব।”

উনি খুব জোরে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল ধ্যানস্থ। বললাম, “চলি বস। আপনি ধ্যান করুন।”

তবু কর্নেলের সাড়া নেই। অগত্যা মনে-মনে চটে গিয়ে উঠে দাঁড়লাম এবং বোরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে একটা কাজে বেরোতে যাচ্ছি, কর্নেলের ফোন এল। “জয়ন্ত! তৈরি হয়ে থাকো। আমি আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।”

“কী ব্যাপার?”

“আমরা গোপালপদ্র-অন-সি রওনা হব।”

“অ্যা ?”

“হ্যা। এইমাত্র ম্যাডানসায়েবের জামাই কুসরো এসেছিলেন। আজ ভোরবেলায় গোপালপুত্র-অন-সি বিচে তাঁর স্বশ্রু ম্যাডানসায়েবকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পদূলিশ ট্রাঙ্ককলে লালবাজারের থ্রু দিয়ে খবর দিয়েছে।”

“মার্ডার নাকি ?”

“তা আর বলতে ? তবে ষাড় মটকে মারা হয়েছে।”

“সেই শয়তান রোবোট্টা ! সেই দানো ব্যাটাচ্ছেলে !”

“তৈরী থেকো, ডার্লিং ! যাচ্ছি।”

ফোন নামিয়ে রেখে দেখি, এই শীতে ঘাম দিচ্ছে। শরীর কাঁপছে। আবার সেই বিভীষিকার মতোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে ? জীববিজ্ঞানী রাজেন অধিকারী যদি তাঁদের দানোর কানের বদলে এবার অন্য কোনও প্রত্যঙ্গে গোপনে রিসিভার-যন্ত্র ফিট করে রাখেন ?

॥ ৪ ॥

বাসে চেপে পুরী। পুরী থেকে ফের বাসে চিৎকা রেলস্টেশন। তারপর ট্রেনে গজাম জেলার বহরমপুর স্টেশন। সেখান থেকে প্রাইভেট-কার ভাড়া করে গোপালপুত্র-অন-সি-তে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় দশটা। সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারের দিকে স্মিথসায়েবের ‘ওয়াশ হাউস’। স্মিথসায়েব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। একসময় কলকাতার বন্দর অফিসে চাকরি করতেন। কর্নেলের পদনো বন্দু।

বাড়ির নীচের তলায় উনি থাকেন। ওপরতলায় দুটো স্যুট। একটাতে হালদারমশায় আছেন।

আছেন, মানে ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু এ-মহুত্বে নেই। দরজায় তালা আঁটা। স্মিথসায়েব তাঁর ‘গেস্ট’দের ব্যাপারে নাক গলান না। তবে স্মিথসায়েবের মতে, এই গেস্ট ভদ্রলোক ছিটগ্ৰস্ত। কারণ আজই বিকেলে তাঁকে বিচের মাথায় মৃদুলা আমলের ভাঙাচোরা পাথুরে বাড়িগুটির ভেতর সন্দেহজনক-ভাবে ঘোরানোর করতে দেখেছেন। সন্ধের দিকে একবার তাঁকে বিচে জাগ্রত করতেও দেখেছেন। স্মিথসায়েব গুঁর প্রতি বেজায় অশ্রুশি।

স্মিথসায়েব গেস্টদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। গুঁর পরিচারিকা মারিয়াম্মা আমাদের খাবার দিয়ে গেল। দেখলাম কর্নেল তার সন্দর্শিত।

কর্নেল তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, “পাশের ভদ্রলোক কি খেয়ে বেরিয়েছেন ?”

মারিয়াম্মা বলল, “উনি বাইরে খান। কখন আসেন কখন যান, জানি না।”

সে এঁটো থালাবাটি গদ্বিহ্নে চলে যাচ্ছে, কর্নেল ডাকলেন, “একটা কথা, মারিয়াস্মা !”

“বলুন সার !”

“আসার পথে শুনলাম নীচে নাকি কে খুন হয়ে পড়ে ছিল আজ ?”

মারিয়াস্মা বৃকে ক্রস এঁকে ভয়পাওয়া গলায় বলল, “সে এক বীভৎস দৃশ্য সার ! শয়তান ছাড়া এ-কাজ কার হতে পারে ? মাথাটা ম্লুচড়ে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।” সে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে গলার স্বর চাপা করল। “জেলবন্দিতে শুনছি, গতকাল সন্ধ্যায় ওরা একটা অশুভ পাখিকে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসতে দেখেছে। পাখিটার ডানা নাকি বিশাল। দক্ষিণে লাইটহাউসের ওধারে উঁচু বালির টিলা আছে। সেদিকেই পাখিটা এসে নেমেছিল। শয়তান ছাড়া আর কিছন্ন নয়।”

মারিয়াস্মা চলে গেলে বললাম, “মারিয়াস্মার গল্পটা বিশ্বাস করলেন ?”

কর্নেল দাড়ি নেড়ে চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর বললেন, “হ্যাঁ !”

“আমি পাখিটার কথা বলছি !”

“আমিও তা-ই বলছি।”

“গল !” বলে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কর্নেল এসবে বিশ্বাস করেন ভাবা যায় না।

কর্নেল চোখ বৃজে চুরুট টানতে টানতে বললেন, “হালদারমশাই পাখিটার পাল্লায় পড়লেন কি না ভাবাছ। এখনও ফিরলেন না। যাইহোক, একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরোব।”

এত রাতে কোথায় বেরোবেন ?”

কর্নেল হাসলেন ! “গোপালপূর অন-সি-তে শীতের তত উপদ্রব নেই। সমুদ্রতীরের আবহাওয়া সবসময় নাতিশীতোষ্ণ।”

বাইরে থোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িলাম। এই দোতলা থেকে সামনে বালিয়াড়ির নীচে সমুদ্র দেখা যায়। কুয়াশার আড়ালে সমুদ্র ঢাকা পড়েছে। ছেঁড়া ঘড়ির মতো চাঁদটাকে অসহায় দেখাচ্ছে। মৃদল আমলের ভাঙুর বাড়িগুলো কুয়াশামাখানো আবছা জ্যোৎস্নায় বস্তু বেশি ভুতুড়ে। বিচে ক্রমাগত ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জনে কানে তালো ধরে যাচ্ছে। বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা নেই। কিন্তু বিরস্তিকর।

বাঁদিকে বালিয়াড়িতে কালো লম্বাটে জিনিসগুলো দেখেই বৃদ্ধলাম জেলেদের ভেলানোকো। সেখানে আবছা একটা মূর্তি দেখতে পেলাম। এত রাতে সামুদ্রিক শীতের হাওয়া খেতে কে বেরোল কে জানে !

একটু পরে মূর্তিটা সটান এসে এই বাড়ির নীচের রাস্তায় দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বললাম, “হালদারমশাই নাকি ?”

তখনই ছায়ামূর্তিটা বাঁ দিকের রাস্তায় চলে গেল। তারপর একেবারে নিপাত্তা। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। ঘরে ঢুকে দেখি, কর্নেল উঠে দাঁড়িয়েছেন আমি কিছ্‌র বলার আগেই বললেন, “চলো বেরনো যাক।”

দরজায় তালা এঁটে আমরা নেমে এলাম। রাস্তায় পেঁঁছে সন্দেহজনক লোকটার কথা বললাম। কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। খুব ভয়ে-ভয়ে হাঁটছিলাম। কখন কোথায় দানোটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বলা যায় না। রাস্তা খাঁ-খাঁ, জনহীন। ল্যাম্পপোস্টগুলো দূরে-দূরে। তাই কোথাও কোথাও জ্যোৎস্না-কুয়াশা-আঁধার মিলেমিশে আছে।

প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর বললাম, “আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?”

কর্নেল সামনে আঙুল তুলে বললেন, “ওই যে আলো জুগজুগ করছে, ওখানে।”

যেখানে পেঁঁছেছি, সেখানটা কাঁচা রাস্তা। বালিতে ভর্তি। দূঁধারে বোপঝাড়। কিছ্‌র উঁচু গাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেলের হাতে টর্চ আছে। কখনও পায়ের সামনে আলো ফেলছেন। হঠাৎ একটা ছোট্ট ঢিল এসে আমার গায়ে লাগল। ভীষণ চমকে উঠে বললাম, “কর্নেল! কে ঢিল ছুঁড়েছে।”

কর্নেল বললেন, “ভূত! চলে এসো।”

“কী আশ্চর্য! সত্যি ঢিল ছুঁড়ল যে!”

কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে আবার পর-পর কয়েকটা ছোট্ট ঢিল এসে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলো ফেলামাত্র ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হল। কেউ কোথাও নেই। অথচ কে ঢিল ছুঁড়েছে রাতদুপুরে? কর্নেল চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, “দৌড়তে হবে। কুইক!”

কর্নেল সত্যি দৌড়তে শুরু করলেন। আমিও ভাবাচাকা খেয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম। এই সময় পেছনে কোথাও ঝিঝিঝি...হিহিহিহি...হোহোহোহো...এই ধরনের বিকট হাসি শোনা গেল।

কিছ্‌রদূর দৌড়ে গিয়ে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেলেন। বললাম, “কী অভূত—”

“ভূত!” কর্নেল হাঁসফাঁস করে বললেন। “রোসো! মিনিট দু-তিন জিরিয়ে নিই। বাপস! বালিতে দৌড়নো সহজ নয়।”

কিছ্‌রক্ষণ পরে সেই আলোর কাছে পেঁঁছে দেখি, গাছপালার আড়ালে একটা বাড়ি এবং গেটে সজ্জনধারী পদলিখ। বদ্বলাম থানায় এসেছি।

দুঁজন অফিসার একটা ঘরে বসেছিলেন। কর্নেলকে দেখেই এক গলায় সম্ভাষণ করলেন, “হাই ওল্ড বস!”

আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর জানলাম একজন সি আই ডি ইনস্পেক্টর সদুঁজন দাস, অন্যজন অফিসার ইন-চার্জ জগপতি রাউত। দুঁজনেই চমৎকার বাংলা বলেন। সদুঁজনবাবু বললেন, “দেঁর দেখে ভাবছিলাম ওশান হাউসে গিয়ে

খোঁজ নিই ! কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?”

কর্নেল বললেন, “নাহ্ । চমৎকার এসেছি ।”

জগপতিবাবু বললেন, “আমি বহরমপুর-গজ্জাম স্টেশনে জিপ পাঠাতে চেয়েছিলাম । মিঃ দাস নিষেধ করলেন । আপনি নাকি পদুলিশের জিপে চাপা পছন্দ করেন না !”

জগপতিবাবু হেসে উঠলেন । কর্নেল বললেন, “কখনও-কখনও করি না । ওতে আমার কাজের অসুবিধে হয় । যাই হোক, মিঃ দাস, সেই চিঠিটা দেখতে চাই ।”

সদরজনের ইশারায় জগপতিবাবু দেওয়ালে আঁটা আয়রনচেস্ট থেকে একটা ফাইল বের করলেন । ফাইলের ভেতর একটা কাগজে সাঁটা অজস্র কাগজকুচি এবং কুচিগদুলোতে কিছু লেখা আছে । কর্নেল খুঁকে গেলেন । ইতিমধ্যে তাঁর হাতে আতসকাচ বেরিয়ে এসেছে ।

সদরজনবাবু বললেন, “কুচিগদুলো ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলের ওদিকে নীচু জমিতে পড়ে ছিল । শিশিরে অধিকাংশ চূপসে গেছে । আর পড়ার উপায় নেই । আমি যেভাবে জোড়াতালি দিয়েছি, তা ভুল হতেই পারে । তবে মোটামুটি এটুকু বোঝা যায়, কেউ ম্যাডানসায়েরকে এখানে আসতে বলোঁছিল । হাতের লেখা ইজিবিজি । তাছাড়া ইংরেজ বানানও ভুল ।”

জগপতি বললেন, “ঠিক তাই । ভুল্লোককে মার্ডার করার জন্যই ডেকেছিল । জুয়েল ফেরত দেওয়াটা ছিল ।”

বদ্বলাম, এঁরা সম্ভবত কেসটা জানেন । বললাম, “কিন্তু ঘাড় মটকে খুন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী ?”

জগপতি হাসলেন । “ভূতের কীর্তি বলে রটেছে । তাছাড়া আগের রাতে নাকি প্রকাণ্ড একটা পাখি সমুদ্র থেকে উড়ে আসতে দেখেছে জেলেরা । তবে মর্গের রিপোর্টে বলছে, সত্যিই কতকটা ঘাড় মটকে—মানে মদুছুটা মদুচড়ে ঘুরিয়ে খুন করেছে । প্রকাণ্ড জোর আছে খুনের গায়ে ।”

বললাম, “তা হলে—”

এবার বাধা দিলেন কর্নেল ! রুদ্ধভাবে বললেন, “প্লিজ জয়ন্ত ! এখন কোনও প্রশ্ন নয় ।”

চূপ করে গেলাম । একটু পরে কর্নেল ফাইলটা ফেরত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন । “মিঃ দাস । কাল সকালে, ধরুন আটটা নাগাদ আমি সি-বিচে অপেক্ষা করব । আপনি আমাকে দেখিয়ে দেবেন, কোথায় ম্যাডানসায়েরের বডি পড়ে ছিল ।”

সদরজনবাবু বললেন, “অবশ্যই । আর আপনি বলেছিলেন গ্র্যান্ডে গত তিনদিনের আবাসিকদের লিস্ট দিতে । এই নিন । এতে আপনার বলা নামের কেউ নেই । একুশ নম্বর ডাবলসদ্যটে দু’জন ভারতীয় আছেন । একজন

অবাঙালি মদুসলিম মইনুদ্দিন আমেদ এবং অন্যজন তাঁর গোয়ানিজ বন্ধু পিটার নাজারেথ। দৃষ্টিতেই চামড়াব্যবসারী। নাজারেথ অসদৃশ্য হয়ে পড়েছেন। শয্যাশায়ী অবস্থা।”

“আমাদের মদুখে দাড়ি আছে কি?”

“আছে। ধর্মপ্রাণ মদুসলিম। মাথায় টুপি। পরনে শেরওয়ানি-চুস্ত।” সদুর্জনবাবু আমাদের বিদায় দিতে এলেন। গেটের কাছে এসে বললেন, “আপনার সন্দেহভাজন লোক দৃঢ়তা এখনকার কোনও হোটেলের ওঠেনি।” তন্নতন্ন খোঁজা হয়েছে! তবে কারও বাংলো বা বাড়িতে খুঁজতে সময় লাগবে! আবার এমনও হতে পারে, তারা ম্যাডানসাল্কেকে খুন করেই চলে গেছে।”

“আমাদের হালদারমশাইয়ের খবর নিয়েছেন?”

“আজ দুপুরে থানায় এসেছিলেন। আপনি আসছেন কি না জানতেই এসেছিলেন। কিন্তু উনি তো ওশান হাউসেই আছেন?”

“আছেন। তবে দেখা হয়নি। ঠাঁর সম্পর্কে আমার দৃঢ়বাবনা আছে, মিঃ দাস! খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ মানুস। কোনও বিপদে না পড়েন!”

সদুর্জনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, “কথাবার্তা হাবভাবেই সেটা বদুঝি। আমাকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, রিটার্নার করেই যেন কলকাতা চলে যাই এবং ঠাঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ঢুকি।”

সদুর্জনবাবু চলে গেলেন। এবার কর্নেল অন্য রাস্তায় এগোলেন। এটা পিচমোড়া সদুন্দর রাস্তা। দৃঢ়ধারে ল্যাম্পপোস্ট। কর্নেল বললেন, “ওই রাস্তাটা শর্টকাট ছিল। এই রাস্তায় ওশান হাউস অনেকটা দূর। কিন্তু উপায় নেই ডার্লিং! এই শীতের রাতে ভুতের ঢিল খেতে আমার আপত্তি আছে।”

বললাম, “ভুত-টুত নয়। রাজেনবাবু সেই দানোকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন! আমাদের ভুতের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোই ঠাঁর উদ্দেশ্য।”

“জয়ন্ত, রাজেনবাবু ইচ্ছে করলে তাঁর দানোর হাতে লেসারঅস্ট্র দিয়ে আমাদের ছাই করে দিতে পারেন।”

অতিকে উঠে বললাম, “সর্বনাশ! তা হলে বডু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে যে?”

কর্নেল হাসলেন। “তা হচ্ছে। চিন্তা করো, ম্যাডানসাল্কেবের বাড়ির মাটির তলার ঘরে লুকনো ইম্পাতের ভল্ট গলিয়ে হিরে চুরি! ইম্পাতে গলানোর চেয়ে মানুস গলানো এবং ছাই করা কত সোজা! তাছাড়া লেসারঅস্ট্র দূর থেকে প্রয়োগ করা যায়। দানোটা তোমাকে কানমলার সুযোগই দেবে না।”

হেসে ফেললাম। “ভ্যাট! হেঁয়ালি করা আর ভয় দেখানো আপনার স্বভাব।”

হঠাৎ কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, “স্বভাব কী বলছ জয়ন্ত!

ওই দ্যাখো, গাছের আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কুইক! আমরাও লুকিয়ে পড়ি।”

রাস্তার দু’ধারে গাছ এবং ঝোপঝাড়। মাঝে-মাঝে একটা করে বাংলাবাড়ি। কর্নেল আমাকে টেনে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন। গর্দভ মেরে কিছুদ্ধকণ বসে রইলাম দু’জনে। আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি।

এক সময় কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তেমনই চাপা স্বরে বললেন, “চলো!”

রাস্তায় গিয়ে বললাম, “কোথায় লোক দেখলেন?”

কর্নেল বললেন, “ওই দ্যাখো, চলে যাচ্ছে!”

আন্দাজ তিরিশ মিনিটের দূরে রাস্তার বাঁকে একটা আবছা মূর্তি সদ্য মিলিয়ে যাচ্ছে। হস্তদন্ত হেঁটে বাঁকে পেঁছা দেখি, আবছা মূর্তিটা যেন হাটছে না। রাস্তার ওপর ভেসে যাচ্ছে।

সে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলে কর্নেল বললেন, “কপালে দুর্ভাগ্য আছে ডার্লিং! আবার বালি আর জঙ্গল ভাঙতে হবে। একটা বালির টিলা ডিঙাতেও হবে। এসো।”

পা বাড়িয়ে বললাম, “ও কে?”

“সেই দানোটা বলেই মনে হল। হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে। বন্ড বেশি খুঁকি নিয়েছিলাম। তবে খুঁকি নেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ম্যাডান-সাবেবকে মেরে রাজেন অধিকারী গোপালপুর-অন-সি ছেড়ে চলে যায়নি এটা জানা গেল। কিন্তু কেন যায়নি, সেটাই রহস্য। এটা জানা গেলেই রহস্যের সমাধান হবে। এমনকি, ইয়াজদাগিরদের হিরেও সম্ভবত উদ্ধার করতে পারব।”

বালিয়াড়ি, জঙ্গল এবং একটা আশু বালির পাহাড় ডিঙিয়ে সমুদ্রের বিচে পেঁছতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তারপর ওশান হাউসে যখন পেঁছলাম, তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। পা নাড়তেই যন্ত্রণা কটকট করে উঠছে।

হালদারমশাইয়ের সদ্যটে তেমনই তালা আঁটা। ফেরেন নি। কোনওরকমে জুতো খুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। অভ্যাসমতো প্রাতঃস্নান বেরিয়েছিলেন। মূর্চক হেসে বললেন, “যেভাবে ঘুমোচ্ছিলে, দানোটা এসে তোমার ঘাড় মটকাবার চমৎকার সুযোগ পেত।”

বললাম, “আপনি যেভাবে মনিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন, আপনারও ঘাড় মটকানোর সুযোগ ছিল।”

“দেখা যাচ্ছে, সে এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে না।”

“কিন্তু গত রাতে সে গাছের আড়ালে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল!”

কর্নেল প্রজাপতি ধরা জাল বেড়ে মূছে গুঁটিয়ে রাখাছিলেন। বললেন, “আমাদের জন্য ওত পাততে যায়নি। জায়গাটা দেখে এলাম। ওড়িশার এক

প্রান্তন মন্ত্রীর বাংলাবাড়ির কাছে সে দাঁড়িয়েছিল। ওই বাড়িতে এমন কেউ আছে, যার ঘাড় মটকাতে গিয়ে থাকবে। কোনও কারণে সে-সদ্বাগ পারনি। তাই তাকে রাজেন অধিকারী সরিয়ে নিয়েছে, কিংবা সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। হ্যাঁ—রিমোট কন্ট্রলের সাহায্যে।”

সায় দিয়ে বললাম, “ঠিক বলেছেন। দানোটা গুলতির বেগে যেন ভেসে যাচ্ছিল।”

বাথরুম সেরে এসে দেখি, মারিয়াস্মা ব্রেকফাস্ট এনেছে। খেতে বসে কর্নেল বললেন, “বাংলাবাড়িটার দরজায় তালা। পরে খোঁজ নেব, কে আছে ওখানে। প্রান্তন মন্ত্রী ভদ্রলোক কদাচিৎ আসেন শুনলাম। এলে গুঁর লোক-জনও সঙ্গে থাকে। কেউ নেই। সম্ভবত গুঁর কোনও পরিচিত লোক এসে থাকবে। তবে সে যে-ই হোক, তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত।”

হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল এতক্ষণে। বললাম, “হালদার-মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?”

কর্নেল গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন। তখনই উঠে গিয়ে দেখে এলাম, গুঁর সদ্যটের দরজায় তেমনই তালা আঁটা। অজ্ঞাত ত্রাসে বুকটা খড়স করে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে সি আই ডি ইনস্পেকটর সুরঞ্জনবাবু এসে গেলেন। আমরা সামনের বালিয়াড়ি পেরিয়ে গেলাম। বিচে তত কিছু ভিড় নেই। বিচ ধরে প্রায় আধ কিমিটাক হাঁটার পর লাইটহাউস ছাড়িয়ে গিয়ে বালির একটা টিলার কাছে পৌঁছলাম। সুরঞ্জনবাবু দেখিয়ে দিলেন, কোথায় ম্যাডানসায়েরের মৃতদেহ পড়ে ছিল।

কর্নেল বাইনোকুলারে বালির বিশাল টিলাগদুলো দেখছিলেন। হঠাৎ হতদন্ত এগিয়ে গেলেন। তারপর টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। আমরা ওঁকে অনুসরণ করলাম। টিলার মাথায় উঠে কর্নেল বললেন, “ম্যাডানসায়েরের জুতোর ছাপ কিনা জানি না। তবে ছাপগুলো লক্ষ্য করুন মিঃ দাস! পশ্চিম-দিকের ঢাল থেকেই ছাপগুলো উঠে এসেছে। ওই দেখুন। স্বাভাবিক চড়াইয়ে ওঠার ছাপ। ওঁদিকে বালিটা জমাট। এই টিলার মাথায় আসার পর বিচের দিকে নেমে যাওয়া ছাপগুলো দেখুন। বিচের দিকটা ঢাল। বালি নরম। ক্রমশ স্টোপিংয়ের দৃষ্টি বেড়েছে। ছাপও গভীর হয়েছে। বাঁ দিকে কোনোকুনি নেমে গেছে ছাপগুলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক দৌড়ে নেমেছিলেন। কিন্তু বাঁ দিকে কোনোকুনি কেন? চুড়োয় এসে নীচে বাঁ দিকে কি কাউকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন?”

কর্নেল বাইনোকুলারে ডান দিকটা দেখে এগিয়ে গেলেন। বললেন, “এই যে! এখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল। মাই গডেনেস! সে একলাফে প্রায় তিরিশ ফুট নীচে পড়েছে। ওই দেখুন গভীর দৃটো ছাপ।” কর্নেল নেমে

১৭৩৩ । আবার খেলায় দেখে বললেন, “ডেডব্যাডের দুরূহ এখন থেকে আরও তিরিশ ফুট। জোয়ারের জল ওখান পর্যন্ত আসে না। তার মানে, সে দ্বিতীয় লামে ম্যাডানসাল্লেকে ধরে ফেলেছে। অস্বাভাবিক লং জাম্প!”

সদরঞ্জনবাবু ফ্র্যাংসফ্রেসে গলায় বলে উঠলেন, “অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব!”

॥ ৫ ॥

রাজেন অধিকারীর দানোটোর কথা বলার জন্য উসখুস করছিলাম। কিন্তু কর্নেলের হাবভাব আঁচ করেছি, পদলিখকে তিনি হাতের তাস দেখাতে চান না। অবশ্য বরাবর তাঁর এই স্বভাব।

সদরঞ্জনবাবু বললেন, “কর্নেল! আপনার এই থিওরিটা কিন্তু মানতে পারছি। ১৮। যে তিরিশ ফুট লং জাম্প দিতে পারে, সে অলিম্পিকের মেডেল-জিতা খেলোয়াড়। আপনি কি বলতে চাইছেন খুনি কোনও খেলোয়াড়?”

কর্নেল বাইনোকুলারে দূরে বিচের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুস্জ্ঞন দেখাছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, “চলুন ফেরা যাক।” তারপরে হাঁটতে-হাঁটতে ফের বললেন, “খেলোয়াড় বৈ-কি। মিঃ দাস, আমরা এক সাম্প্রতিক খেলোয়াড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।”

সদরঞ্জনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে ঘাড় দেখে বললেন, “আমাকে এখনই এক জায়গায় যেতে হবে। পরে যোগাযোগ করব’খন।”

উনি চলে যাওয়ার পর আমরা বিচ ধরে হাঁটিছিলাম। ডাইনে সমুদ্রে এখানে-ওখানে কালো-কালো ছোটবড় পাথর দেখা যাচ্ছে। ডেউয়ে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। মৃদু-মৃদু ব্রেকারের গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। চাপ-চাপ ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে। বিচের মাথার পাথরে তৈরি ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। প্রকাণ্ড সব পাথরের চাঙড় বিচে এসে পড়েছে। একটা ভাঙা ঘরের জানালায় কাউকে উঁকি মারতে দেখলাম। গোলগাল মৃদু। মৃদু কেমন একটা হাসি। হঠাৎ মৃদুটা চেনা মনে হল। তখনই মনে পড়ে গেল, রাজেনবাবুর বাড়ির দোতলার জানালায় এই মৃদুটাই দেখছিলাম। দ্রুত বললাম, “কর্নেল! কর্নেল! ওই দেখুন সেই বসন্তবাবু। রাজেনবাবুর দাদা।”

কর্নেল বললেন, “দেখছি। ঠুঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাও কি?”

“ঠুঁর কাছে জানা দরকার, উনি এখানে কেন এসেছেন।”

“চলে যাও তা হলে।”

“আপনিও চলুন!”

কর্নেল হাসলেন। “ডার্লিং! আমি পাগলকে বন্ড ভয় করি, সে তো

জমি জানো! তুমি ইচ্ছে করলে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারো। যাও, চলে যাও!”

তীর কৌতুহলের চাপে পড়েই পাথরের চাঙড় বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। ওপরে উঠে সেই ভাঙা পাথরে ঘরটার দিকে হতদস্ত এগিয়ে গেলাম। কিন্তু জানলায় দেখা সেই মুখটা নেই।

ভেতরে উঁকি মেরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ঘরগুলো বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে চারদিকে তন্নতন খুঁজে আর বসন্তবাবুর পাভা পেলাম না। সবখানে বালির স্তুপ। পোড়ো-পোড়ো ঘরগুলোর মেঝেও বালিতে ভর্তি। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ওধারে পিচ রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায় গিয়ে একপলকের জন্য দেখলাম, বসন্তবাবু ওপাশের একটা পোড়ো জমির পাশে ঘোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন। পাগলের পেছনে দৌড়ানোর মানে হয় না।

বিচে ফিরে গিয়ে কর্নেলকেও দেখতে পেলাম না। অশুভ মানুষ তো!

খানিকটা হেঁটে জেলের ভেলানোকোর কাছে পৌঁছলাম। উঠে গিয়ে ওশান হাউস চোখে পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখি নীচের বারান্দায় বসে স্মিথস্যায়েব হোমিওপ্যাথির ওষুধ বিলোচ্ছেন। একদঙ্গল গরিবগুরুবো চেহারার রুগী দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে স্মিথস্যায়েব সন্তোষ করলেন, “গুড মর্নিং!”

“মর্নিং মিঃ স্মিথ! কর্নেলস্যায়েব কি ফিরেছেন?”

“ফিরলে দেখতে পেতাম।”

“মিঃ হালদার?”

স্মিথ উদ্বিগ্নমুখে বললেন, “না। আমি চিহ্নিত মিঃ চৌধুরী। পদালিশকে খবর দিয়েছি।”

আমার ঘরের চাবি কর্নেলের কাছে। ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় স্মিথস্যায়েবের কাছে আছে। কিন্তু ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। আবার বিচে ফিরে গেলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চমৎকার সময় কাটানো যায়। এদিকটা একেবারে খাঁ-খাঁ জনহীন। জেলবন্দির ছোট্ট ছেলেমেয়ের দঙ্গল খানিকটা দূরে সমুদ্রে নেমেছে। ওটাই ওদের খেলা। কেউ-কেউ জলের ভেতর উঁচিয়ে থাকা পাথরেও উঠেছে। ওদের ভয় করছে না?

নিশ্চয় করছে না। সমুদ্র ওদের আপনজন। সমুদ্র ওদের লড়াই করে বেঁচে থাকতে শেখায়। ওরা যেন সমুদ্রের পাঠশালার পড়ুয়া।

কতক্ষণ পরে আনমনে ডানদিকে মন্বল আমলের ভাঙা কুঠিবাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা মাথা উঁকি মেরে এগোচ্ছে। স্তুপের আড়াল দিয়ে কেউ গর্দভি মেরে কোথাও চলেছে। একটু পরে আর তাকে

দেখা গেল না। মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বসন্তবাবু নন তো ?

বালি ও ধনঃসমুদ্র এবং ভাঙা ঘরের ফোকর গলিয়ে সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘরের বালিতে পড়ে থাকা একটা কাগজের চিরকুট দেখতে পেলাম। চিরকুটটা পড়ে নেই আসলে। একটুকরো পাথর চাপা দেওয়া আছে এক কোনায়।

চিরকুটটা তুলে দেখি, আঁকাবাঁকা ইংরেজি হরফে যা লেখা আছে, তার মানে দাঁড়ায় :

“আজ রাত বশটায় এখানে আসুন। দেখা হবে।”

হালদারমশাইয়ের ভাষায় প্রচুর রহস্য। ষটপট ভেবে নিয়ে চিঠিটা সেই অবস্থায় রেখে দিলাম। তারপর তেমনই গুঁড়ি মেরে এগিয়ে খানিকটা তফাতে একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে বসে রইলাম। এখান থেকে ওই ঘর এবং নীচের বিচ মোটামুটি চোখে পড়ে।

এমন ভাঁজতে বসেছিলাম, কেউ দেখলে ভাববে, নিছক সমুদ্রদর্শন করছি। প্রায় ষটখানেক পরে বিচের দিক থেকে একটা লোককে উঠে আসতে দেখলাম। প্রথমে তাকে সায়েব ভেবেছিলাম। পরে দাঁখি খাঁটি সায়েব নয়। তবে কতকটা সায়েব-সায়েব গড়ন। লম্বা নাকটা দেখার মতো। পরনে জিনস-জ্যাকেট। মাথায় রোদ-বাঁচানো টুপি। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ মনে হল।

লোকটা সেই ঘরের কাছে এসে চাপা গলায় কাকে ডাকল, “হ্যালো।”

বারকতক ডাকার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ঘরের ভেতর উঁকি দিল। তারপর ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ল।

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। হতবুদ্ধি ছুটে গিয়ে সেই ঘরের ফোকরের সামনে দাঁড়ালাম। লোকটা চমকে উঠেছিল। সামলে নিয়ে ইংরেজিতে বলল, “এই পাথরের বাড়িগুলো ভারী অশুভ। কে তৈরি করেছিল জানেন কি ?”

চার্জ করার ভাঁজতে বললাম, “কে আপনি ?”

“ট্যুরিস্ট। আশা করি, আপনিও ট্যুরিস্ট ?”

তার কথায় কান না করে বললাম, “ওখানে একটা চিঠি ছিল, চিঠিটা নিতেই কি আপনি এসেছেন ?”

“চিঠি ! কী বলছেন আপনি ?”

“ঠিক বলছি। চিঠিটা আমি দেখেছি। আপনি সেটা নিয়েছেন। এবার বলুন কে আপনি ?”

পেছন থেকে কর্নেলের কথা ভেসে এল। “সাবধান ডার্লিং ! সেই দানোর কথা ভুলে যেও না।”

শোনামাত্র ভাষাচাকা খেয়ে একলাফে লোকটার কান ধরতে গেলাম। লোকটাও একলাফে সরে গেল। কর্নেল এসে অট্টহাসি হেসে বললেন, “সেমসাইড হয়ে যাচ্ছে জয়ন্ত! আলাপ করিয়ে দিই, ইনি ম্যাডানসায়েরের জামাই মিঃ কুসরো। আর মিঃ কুসরো! আমার স্নেহভাজন বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী মাঝে-মাঝে অত্যাশাহী হয়ে পড়ে। আসলে এটা ওর ভয় পাওয়ারই প্রতিক্রিয়া!”

কুসরো হেসে ফেললেন। “সত্যি বলতে কি, আমি ভয় পেয়েছিলাম। যাই হোক, সেই ভুললোক আমার জন্য একটা চিঠি রেখে গেছেন। এই দেখুন।”

কর্নেল চিঠিটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন, “এটা আমার কাছে থাক। রাত ন’টা নাগাদ ওশান হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর সব ব্যবস্থা হবে। আপনি বরং নীচের দিকে না গিয়ে সদর রাস্তা ধরে বাংলায় যান। সাবধানে যাবেন।”

কুসরো তখনই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন। বললাম, “শ্বশুর চিঠির ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। এবার জামাইকেও চিঠির ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। ব্যাপারটা এইতো?”

কর্নেল সে-কথার জবাব না দিয়ে বললেন, “তখন বসন্তবাবুকে কোথায় হারিয়ে ফেলে?”

“রাস্তার ওধারে। তো মিঃ কুসরো কি শ্বশুরের ডেডবডি নিতে এসেছেন?”

“হ্যাঁ। ঔর বাবার বন্ধু এক প্রাক্তন মন্ত্রীমশাই। তাঁর সাহায্যে আমি’র হেলিকপ্টারে ম্যাডানসায়েরের বডি সকালেই কলকাতা পাঠানো হয়েছে। কুসরো যাননি। মানে, কলকাতায় উনি যখন আমাকে ফোন করেন, তখন আমি ওঁকে একটা দিন থেকে যেতে বলেছিলাম। তবে জানতাম না, কুসরো মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলায় উঠেছেন। উঠে অবশ্য ভালই করেছেন। কারণ আমাদের প্রিয় বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর সান্নিধ্যে থাকলে উনি নিরাপদ।”

অবাক হয়ে বললাম, “ওই বাংলাতে চন্দ্রকান্তবাবুও উঠেছেন নাকি?”

“হ্যাঁ। চলো, চন্দ্রকান্তবাবুকে ওশান হাউসে বসিয়ে রেখে এসেছি।”

বুঝলাম, আমি যখন বসন্তবাবুর পেছনে ছুটছিলাম, তখন কর্নেল আমাকে ফেলে সেই বাংলায় চলে গিয়েছিলেন। তাই ওঁকে আর দেখতে পাইনি। কিন্তু হঠাৎ ওভাবে চলে না গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন। কেন করেন নি? এমন কী ঘটেছিল যে, প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন?

যেতে-যেতে কথাটা তুললাম। কর্নেল বললেন, “বাইনোকুলারে দেখেছিলাম, বিজ্ঞানী ভুললোক ওঁর ডিটেক্টর যন্ত্র নিয়ে ব্যাকওয়াটারের ওঁদিকে

ঘরঘর করছেন। কাজেই ওঁর কাছে না গিয়ে পারলাম না। হ্যাঁ, গত রাতে দানোটা বাংলায় ঢুকতে পারিনি। বিজ্ঞানীর কারবার! মারাত্মক কী অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে নাকি বাংলাটা ঘিরে রেখেছিলেন।”

“কিন্তু হালদারমশাইয়ের কী হল?”

কর্নেল গভীর মনে বললেন, “জানি না।”

ওশান হাউসের দোতলায় আমাদের সদ্যটে ঢুকে দেখি, বিজ্ঞানীপ্রবর ইঞ্জিনের হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন। কারণ ওঁর নাক ডাকছে। আমি যেই ‘চন্দ্রকান্তবাবু’ বলে ডেকেছি, আমনিই তড়াক করে সোজা হলেন এবং বললেন, “হিরে আছে! শিওর!”

হাসতে-হাসতে বললাম, “স্বপ্ন দেখছিলেন বন্ধি?”

চন্দ্রকান্ত চোখ কচলে বললেন, “সরি! সারারাত ঘুমোইনি। ঘুমনো দরকার।” বলে আমার দিকে তাকালেন। “হ্যালো জয়ন্তবাবু! আসুন, আসুন। আপনার কথা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পরেছিলাম!”

“কেন বলুন তো?”

“হিরেটা উদ্ধার হয়ে গেলে আপনাকে একটা রোমহর্ষক স্টোরি দেব। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় বেরোলে হইচই পড়ে যাবে। আমার মাথা তো গুলিয়ে গেছে মশাই। ভাবা যায়? হিরেতে এক ধরনের রশ্মি আছে, যা প্রাণীর দেহকোষের পবিত্রন ঘটতে পারে। হিরে ঠিক যেভাবে কাচ কাটতে পারে, সেইভাবে হিরের সেই বিস্ময়কর রশ্মিপ্রবাহ ডি এন এ অণুতে কেটেকটে —” চন্দ্রকান্ত হঠাৎ কথা থামিয়ে ফিক করে হাসলেন।

কর্নেল আতসকাচ দিয়ে চিঠিটা দেখতে ব্যস্ত। আমাদের কথার দিকে ওঁর কান নেই।

বললাম, “চন্দ্রকান্তবাবু! আপনি বললেন, হিরে আছে। কোথায় আছে?”

চন্দ্রকান্ত গভীর হয়ে বললেন, “এখানেই।”

“এখানেই মানে? গোপালপুর-অন-সি’-তে?”

“শিওর। ওই ব্যাকওয়াটারের কাছাকাছি কোথাও লুকনো আছে। ডিটেইন্ডে সাড়া পেয়েছি কিন্তু ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারছি না, এটাই সমস্যা।”

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে বললাম, “হিরেটা এখানে এল কী করে? আনল কে? কেনই বা আনল?”

চন্দ্রকান্ত চিবুকের দাড়ি খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, “তা জানি না মশাই! কর্নেল ওসব রহস্য জানেন বলেই আমার ধারণা।”

কর্নেল চিঠিটা পকেটস্থ করে বললেন, “চন্দ্রকান্তবাবু! মিঃ কুসরো বাংলায় ফিরে গেছেন। লাঞ্ছন সময় হয়ে এল। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।”

বিজ্ঞানী তখনই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “হ্যাঁ চলি! আমার একটা লম্বা ঘুমও দরকার।”

উনি চলে গেলে বললাম, “প্রাক্তন মন্ত্রী ভদ্রলোক কি চন্দ্রকান্তবাবুর পরিচিত?”

“পরিচিত না হলে চন্দ্রকান্তবাবু ওখানে উঠবেন কেন? বাংলোটা বেশ বড়। অনেক ঘর। কাজেই প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের পক্ষে তাঁর একাধিক প্রিয়জনকে ঠাই দেওয়ার অসুবিধে নেই। কেয়ারটেকার গোমস তাঁর প্রিয়জনদের সেবার জন্য বহাল রয়েছে।” বলে কর্নেল উঠলেন। “তুমি কি স্নান করবে? আমি বলি, বরং সমুদ্রে স্নান করে এসো। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।”

আঁতকে উঠে বললাম, “মাথাথারাপ? এখানকার সমুদ্র মানুষথেকে। সবসময় হাঁউমাউখাউ করে চেঁচাচ্ছে। জলের ভেতর পাথরগুলো যেন সমুদ্রের দাঁত। বৃঝলেন তো? পেলেই পাথরের দাঁতে চিবিয়ে গিলে ফেলবে।”

“তা হলে সুইচ টিপে মারিয়াম্মাকে ডাকো। গরম জল করে দেবে। আমি তো সপ্তাহে একদিন স্নান করি। আজ আমার স্নানের দিন নয়।”

দুপুরের খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া আমার অভ্যাস। পূরনো বাংলায় একে বলে ‘ভাতঘুম’। কিন্তু কর্নেল বাদ সাধলেন। বললেন, “এখনই মিলিটারির জিপ আসবে। তৈরি থাকো।”

মনে পড়ে গেল, এখানে সেনাবাহিনীর একটা ঘাটি আছে। ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এখানে এসেছেন একটা রহস্যের সমাধানে। কিন্তু এসেই কখন সেনাবাহিনীর কোনও স্নেহভাজন কর্তব্যাক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে মিলিটারি জিপে আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেটা উঁচুতলার অফিসারদের কোয়ার্টার এলাকা। বাংলোবাড়ি এবং সুদৃশ্য লন, ফুলবাগিচা। একটা বাংলোর লনে ঘাসের ওপর চেয়ারটোবল পেতে একজন শিখ সামরিক অফিসার পাইপ টানছিলেন। কর্নেলকে দেখে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ করলেন। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিও এক কর্নেল। কর্নেল পরমজিৎ সিং।

পরমজিৎ বললেন, “পূরনো ক্যান্টিন-রেকর্ডে আপনার দেওয়া নামটা পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ভদ্রলোক সোলজার্স ক্যান্টিনে ফুড সাপ্লায়ার ছিলেন।”

কর্নেল বললেন, “ওশান হাউসের মিঃ স্মিথের কাছে কথায়-কথায় জানতে পারি, এই নামের ভদ্রলোক একসময় এখানে ছিলেন। ফুড কন্ট্রোল্লার করতেন। ধন্যবাদ কর্নেল সিং। অসংখ্য ধন্যবাদ!”

বেয়ারা কর্ফি রেখে গেল। কর্ফি খেতে-খেতে পরমজিৎ একটু হেসে বললেন, “কিন্তু এবার যে রহস্যটা জানতে ইচ্ছা করছে কর্নেল সরকার? বৃঝতে পেরেছি আপনার এবারকার গোপালপুত্র-অন-সি-তে আসার উদ্দেশ্য

সেই বিরল প্রজাতির 'জগন্নাথ প্রজাপতি' ধরা নয়, আমাদের একজন প্রাক্তন ফুড সাপ্লায়ারকে ধরা। কিন্তু রেকর্ডে ঠিক বিরুদ্ধে তো কিছুই নেই। অসুস্থতার জন্য কারবার গড়িয়ে কলকাতা ফিরে যান। উনি কি সেই জুয়েলার ম্যাডান-সায়ের মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়েছেন?"

কর্নেল জোরে মাথা নাড়লেন। "না, না! উনি অত্যন্ত সদাশয় পরোপকারী মানুষ।"

"তা হলে ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, শুন।"

"যথাসময়ে জানাব।"

এর পর দু'জনে সামরিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। আলাপ এবং কফি খাওয়া শেষ হলে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি কর্নেল সিং! পরে দেখা হবে। একটু তাড়া আছে।"

কর্নেলের নির্দেশে এবার মিলিটারি জিপ আমাদের লাইট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। আমরা বস্ত্র এলাকার ভেতর দিয়ে একটা নীচু জায়গায় নেমে গেলাম। বললাম, "কোথায় যাচ্ছি?"

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বালির টিলাগুলো দেখে নিয়ে বললেন, "চলো তো!"

যেতে-যেতে বললাম, "সেই ফুড সাপ্লায়ার ভদ্রলোক কে?"

"বসন্ত অধিকারী।"

চমকে উঠে বললাম, "অ'্যা?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল হাসলেন। "বসন্তবাবুকে ঠিক বন্ধ পাগল বলা চলে না। তবে মাথায় একটু গডগোল ঘটেছে, সেটা ঠিকই। এই গোপালপুর-অন-সি-র প্রত্যেকটি ইঞ্চি ঠিক নথিভরণে। ডার্লিং! কাল রাত্তিরে উনিই ভুত হয়ে আমাদের টিল ছুঁড়েছিলেন। আমরা চরিত্রের মানুষ। মজা করার সন্যোগ পেলে ছাড়তে চান না।"

বালির টিলার কাছে পৌঁছে বললাম, "কিন্তু আমরা যাচ্ছিটা কোন চুলায়?"

"ঈর্ষ ধরো জয়ন্ত!" বলে কর্নেল টিলায় উঠতে থাকলেন। ক্রমশ সমুদ্রের গর্জন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্র চোখে পড়ল। চুড়োয় ওঠার পর বাইনোকুলারে বাঁ দিকে কিছু দেখে কর্নেল বললেন, "ওই যে দেখছ একটা হোটেল। তুমি এখানে বসে লক্ষ রাখো। যদি দ্যাখো, শেরওয়ানিচুস্ত-চুপিপরা কোনও মদুসলিম ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী বিচে নামছেন, তুমি গিয়ে ওঁদের সঙ্গে ভাব জমাবে। যেভাবে হোক, কথায়-কথায় ওঁদের আটকে রাখবে। আমি সেই সন্যোগে হোটেলটিকে সন্ধ্যা হানা দেব।"

কর্নেল হনহন করে সোজা এগিয়ে গেলেন। তারপর অদৃশ্য হলেন।

হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম। শীতের বেলা পড়ে আসছিল। বসে আছি তো আছি। কতক্ষণ পরে দেখি, সেই মদুসলিম ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী কখন আমার ঠিক নীচে বিচের ওপর চলে এসেছেন। দৃ'জনে বিচ ধরে দক্ষিণে এগোচ্ছেন। তবে হাঁটার গতি বেশ দ্রুত।

গতরাতে থানায় ওঁদের কথা শুনেছি। নাম দুটি মনে পড়ল। মইনুদ্দিন আমেদ এবং পিটার ন্যাজারেথ। দৃ'জনেই নাকি চামড়া ব্যবসায়ী। কিন্তু কর্নেলের দৃষ্টি ওঁদের ওপর পড়ল কেন?

একটু ইতস্তত করে বিচে নেমে গেলাম। ওঁরা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ওঁদিকটা একেবারে নির্জন খাঁ-খাঁ। বাঁ দিকে সমুদ্র সামনে গজরাচ্ছে। হস্তদন্ত এগিয়ে “হ্যালো” বলে সম্ভাষণ করলাম। কিন্তু সমুদ্রের গর্জনে কথাটা হারিয়ে গেল। দুটো বালির টিলার মধ্যখানে খাড়ির মতো একটা সঙ্কীর্ণ জায়গা দেখা যাচ্ছিল। সমুদ্রের জল সেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। জলটা পিছিয়ে সমুদ্রে সরে গেলে ওঁরা দৃ'জনে খাড়িটা পেরিয়ে ডাইনে অদৃশ্য হলেন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

আবার সমুদ্রের জল এসে খাড়িতে ঢুকল। তারপর জলটা পিছিয়ে যেতেই খাড়ি পেরিয়ে গেলাম। ডাইনে ঘুরে দেখি, বালিখাড়িতে একটা পাথরের ঘর অর্ধেকটা ভূবে আছে। ফাটলধরা পোড়ো ঘর। ছাদ ধরসে পড়েছে। এ-ও নিশ্চয় মৃদল আমলের কোনও বাড়ি। মইনুদ্দিন এবং ন্যাজারেথ সেখানে ঢুকে গেলেন।

সাবধানে এগিয়ে সেই ঘরের কাছে গেলাম। গর্দাঁড়ি মেরে বসলাম। হঠাৎ একটা আতর্নাদ ভেসে এল। তারপর কেউ চিৎকার করে উঠল খ্যানখেনে গলায়, “শাট আপ!”

গর্দাঁড়ি মেরে পাথরের চাঙড়ের আড়ালে গিয়ে উঁকি দিলাম। যা দেখলাম তা সাংঘাতিক ব্যাপার। দিনশেষের আবছা আলোয় ঘরের মেঝেতে বালিতে কোমর পর্যন্ত পর্দাতে রাখা হয়েছে একটা লোককে। তার হাত দুটো পিঠের দিকে বাঁধা। এবং লোকটা আর কেউ নয়, আমাদের হালদারমশাই!

ন্যাজারেথ তাঁর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে চুল খামচে ধরে আছে। মইনুদ্দিন সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে, “স্পিক দ্য ট্রুথ!”

আর সহ্য করতে পারলাম না। একলাফে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তারপর ঝাঁপ দিলাম মইনুদ্দিনের ওপর। তার টুপি খসে পড়ল। সে হুঙ্কার দিয়ে কিছন্ন বলল। ন্যাজারেথ অমনই বালিতে গর্ত খনড়ে শুরুর করল। ততক্ষণে মইনুদ্দিনের সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি বেধে গেছে। তার দাড়ি খামচে ধরেছিলাম। উপড়ে এল। তখনই চিনতে পারলাম তাকে। কী আশ্চর্য, এ তো সেই রাজেন অধিকারী!

চেনামাত্র তাকে ছেড়ে ন্যাজারেথের কান ধরতে লাফ দিলাম। ন্যাজারেথ যে সেই দানো অর্থাৎ কৃত্রিম মানুষ, এ-ও মদহুতে বদলে গেছি। কিন্তু তার কান মলে দেওয়ার সুযোগ পেলাম না। সে আমাকে ঠেলে বালির ওপর ফেলে দিল। রাজেন অধিকারীও আমার বৃকের ওপর এসে বসল। মদুখে নিষ্ঠুর হাসি।

আমি তার দিকে হাত ওঠানোর সুযোগ পেলাম না। আমার দুই বাহুতে সে দুই পা চাপিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে কী একটা খুদে কালো বোতামের মতো জিনিস আমার কপালে স্টেটে দিল। মনে হল, অতল শূন্যে তলিয়ে যাচ্ছি।

॥ ৬ ॥

প্রথমে ভেবেছিলাম একটা বিকট দৃশ্যবল দেখাছি। চাঁদের আলোর জায়গাটা মোটামুটি স্পষ্ট। আমার নিম্নাঙ্গ নিঃসাড়। ঠাণ্ডায় জমে গেছে। তারপর বদ্বলাম আমার কোমর পর্যন্ত বালিতে পৌঁতা এবং হাত দুটো পেছনে বাঁধা। যন্ত্রণা টের পেলাম। তখন সব কথা মনে পড়ে গেল। ডাকলাম, “হালদার-মশাই! হালদারমশাই!”

কোনার দিকে ছায়া। সেখান থেকে হালদারমশাইয়ের করুণ সাড়া এল, “আছি।”

“একটা কিছন্ন করা দরকার, হালদারমশাই।”

হালদারমশাই রুগির গলায় অতি কষ্টে বললেন, “চম্বিশ ঘণ্টা পৌঁতা আছি জয়ন্তবাবু। পায়ে একটুও শক্তি নাই।”

“আপনাকে কোথায় ধরেছিল?”

“সি বিচে কাইল রাস্তারে অগো ফলো কইরা কইরা বিপদ বাধাইছি।”

এই সময় বাইরে ধূপধূপ শব্দ কানে এল। হালদারমশাই চাপা গলায় বললেন। “চুপ কইরা থাকেন। চক্ষু খুলবেন না।”

চোখ বোজার আগে দেখে নিলাম, দুটো লোক আসছে। একজনের কাঁধে মড়ার মতো কেউ বদলেছে। তারা ঘরে ঢুকলে চিনতে পারলাম। রাজেন অধিকারী এবং তার দানো। দানোর কাঁধে আর-একজন মড়ার মতো লোক। রাজেন অধিকারী হৃদয় দিল তখনকার মতো। অমনই দানোটা ‘মড়া’ নামিয়ে বালিতে গর্ত খুঁড়তে থাকল। গর্তটা সে হাত দিয়েই খুঁড়ছিল। বদ্বলাম, রাজেন অধিকারীর হৃদয় সম্ভবত বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের ভাষায় ‘সোনিম’। বিশেষ ধর্মান্তরঙ্গের সাহায্যে হৃকুম জারি।

দানোটা থাকে আমাদের মতো কোমর পর্যন্ত পড়তে হাত দুটো পেছনে

বাঁধল, সে যে মড়া নয় তা একটু পরে বুঝলাম। রাজেন অধিকারী তাকে বলল, “হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, না বলা পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকো।”

সে হি হি করে হেসে উঠল।

“শাট আপ। পাগলামি ঘুচিয়ে দেব। বলো হিরে কোথায়?”

“বলব না!”

“না বললে দাদা বলে খাতির করব না আর।”

“ইস! আমি তোর সত্যিকার দাদা নাকি? বেশি জাঁক দেখাসনে রাজু। সব ফাঁস করে দেব। যখন বাপ-মা মরে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মানদুষ করেছিলাম। তুই নেমকহারাম!”

“চুপ! টাম্বাকে হুকুম দিলে এখনই তোমার মনুড় মনুড়ে দেবে।”

“তাই দে না। মলে তো বেঁচে যাই। ওরে হতভাগা তোর বাবার আত্মার সঙ্গে আমার সবসময় দেখা হয় জানিস! দাঁড়া! ডাকাছি তাকে। “প্রমথ! প্রমথ! কাম অন! তোমার হারামজাদা পদ্মটিকে এসে শাস্তা করা দিক।”

“শাট আপ! বলো হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?”

“হিরে তোর বাপের? নওরোজিসায়েবের সঙ্গে চক্রান্ত করে ম্যাডান-সায়ের হিরে ছুরি করেছিল। ওই ভুতটাকে দিয়ে নওরোজিকে মারলি। শেষে ম্যাডানসায়েরকে মারলি। পাপের ভয় নেই তোর?”

রাজেন অধিকারী ফুঁসে উঠল। “তুমিও কম পাপী নও। আমার ল্যাব থেকে হিরে ছুরি করে ম্যাডানসায়েরকে চিঠি লিখেছিলে এখানে আসতে। তুমি থাকো ডালে-ডালে, আমি থাকি পাতায়-পাতায়। এবার ম্যাডানসায়েরের জামাইকে হিরে ফেরত দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। সে-খবরও আমি রাখি, যাক গে বলো—হিরে কোথায় রেখেছ?”

হালদারমশাই বলে উঠলেন, “বসন্তবাবু! আপনি ভুল করছেন! হিরে কলকাতায় ম্যাডানসায়েরের দিয়া দিলেই পারতেন। এই ঝাঁবল হইত না!”

রাজেন অধিকারী ঘুরে দাঁড়াল। “তবে রে ব্যাটা টিকটিকি! বলে তেমনই হুকুম দিতেই ‘টাম্বো’ গিয়ে হালদারমশাইয়ের চুল খামচে ধরল। হালদারমশাই আতঁনাদ করলেন।

বসন্তবাবু বললেন, “আপনি ভাল বলেছেন মশাই! কলকাতায় হিরে দিলে এই রাজু ব্যাটাচ্ছেলে ঠিক টের পেয়ে যেত। ওর যন্ত্রমন্ত্রে সব ধরা পড়ে যেত। সেজন্মেই গোপালপুরে আসতে লিখেছিলাম। আমার চেনা জায়গা। তা আপনাকে দেখাছি জ্যান্তপদ্মেছে?” হিহি-হোহো করে একচোট হাসার পর বসন্তবাবু এতক্ষণে আমাকে দেখতে পেলেন। বললেন, “মলো চ্ছাই। এ আবার কে? ও রাজু! একে কেন পদ্মলি?”

রাজেন অধিকারী ভেড়ে এল। “চুপ ! এই শেষবারের মতো বলছি, বলো হিরে কোথায় ?”

বসন্তবাবু ভেঁটি কেটে বললেন, “তোমার বাপের হিরে ? দাঁড়া তোমার বাপের আত্মাকে ডাকি : সে নিজেকে এসে বলুক, হীরে কার ?” বলে ঘাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় বললেন, “রাতবিরেতে তোমার বাপ পাখি হয়ে সমুদ্রের ওপর চক্কর দিয়ে বেড়ায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তা জানিস ?”

রাজেন অধিকারী বলল, “তা হলে মরো ! টাম্বো ! টাম্বো ! টাম্বো !”

তার হাতে টর্চের মতো একটা জিনিস থেকে নীলচে আলো জ্বলল উঠল। তারপর যা দেখলাম, শিউরে উঠলাম। দানোটা হালদারমশাইয়ের চুল ছেড়ে দিয়ে বসন্তবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে কী একটা বের করল। সেটা আর কিছদু নয়, একটা কালো রঙের ছোট্ট সাপ। সাপটার লিকালিকে জিভ। বসন্তবাবুর মুখের কাছাকাছি সে সাপটাকে নিয়ে গেল। বসন্তবাবু আতর্নাদ করলেন, “প্রমথ ! প্রমথ ! বাঁচাও !”

তিনি সম্ভবত রাজেন অধিকারীর বাবার প্রেতাত্মাকে ডাকার জন্য সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরালেন। তারপরই চোঁচিয়ে উঠলেন, “ওই সে আসছে ! ওই দ্যাক রাজু। পাখি হয়ে তোমার বাপ উড়ে আসছে।”

অতিকটে মৃদু ঘুরিয়ে দেখি, কী অদ্ভুত। সমুদ্রের আকাশে বিশাল লম্বা ডানাওয়া একটা পাখি উড়ে আসছে এই বালিঝাড়ির দিকে।

রাজেন অধিকারী পাখিটাকে দেখা মাত্র হৃদয় দিল। তখন দানোটা এক লাফে বাইরে চলে গেল। নীলচে আলোটা নিভিয়ে রাজেন অধিকারীও বেরোল। বাইরে এক পলকের জন্য চোখ ঝলসানো আলো দেখলাম। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, কেউ রাজেন অধিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর ধস্তাধস্তি, হাঁকডাক, বালিতে ধূপধূপ শব্দ। জ্যোৎস্নায় অনেক ছায়ামূর্তির ছটোছটটি।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বলে উঠলেন, “খাইছে !”

সেই সময় বাইরে কর্নেলের সাড়া পেলাম। “জয়ন্ত ! জয়ন্ত !”

চোঁচিয়ে বললাম, “এখানে ! এখানে !”

টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর কর্নেলকে দেখতে পেলাম। বললেন, “কী সর্বনাশ ! হালদারমশাইকেও পড়েছে দেখছি।”

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, “হঃ !”

কয়েকজন পদলিখ ঘরে ঢুকে বাঁধন খুলে দিয়ে বালি সরিয়ে আমাদের ওঠাল। আমি পা ছাড়িয়ে বসলাম। হালদারমশাই কিন্তু তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পা ছোঁড়াছড়ি করে বললেন, “আই অ্যাম অলরাইট। বাট হেভি ক্ষুধা পাইছে।”

বসন্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “বাই। প্রমথের আত্মাকে দেখা করে আসি।”

কর্নেল বললেন, “বসন্তবাবু! প্রমথ কে?”

“ওই শয়তানটা রাজদর বাবা বসন্ত ভাল লোক ছিল মশাই। না, না! বাই দেখা করে আসি। পর-পর দু’বার পাখি হয়ে উড়ে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।”

বসন্তবাবু বেরিয়ে গেলেন। আমি উঠে দাঁড়িলাম। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। পা বাড়াতে গেছি, হঠাৎ পায়ের কাছে কর্নেলের টর্চের আলোয় সেই সাপটাকে দেখতে পেলাম। চমকে উঠে সরে গেলাম। কর্নেল সাপটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, “এ-ও কিন্তু কৃত্রিম সাপ জয়ন্ত! তবে টাম্বোর মতো নয়। জেনোম থিওরির সঙ্গে এটার সম্পর্ক নেই। এটা নেহাত খেলনা সাপ। চলো, বেরনো যাক।”

বাইরে গিয়ে দেখি, পদ্মলিশের দঙ্গল ছায়ামূর্তির মতো বিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে সি আই ডি অফিসার সুরজনবাবু বেরিয়ে এলেন। বললেন, “স্যারেন্টস্ট ভদ্রলোকের কান্ডকারখানা দেখছিলাম কর্নেল। দিনে-দিনে পৃথিবীটা ওঁরা একেবারে অন্যরকম করে দিচ্ছেন। মাথা ঠিক রাখা কঠিন।”

কর্নেল বললেন, “চন্দ্রকান্তবাবুর চেয়ে সেরা বিজ্ঞানী এখন আপনাদের হাতে মিঃ দাস! শিগগির গিয়ে ওঁকে আর্মির কর্নেল সিংহের জিম্মায় রাখার ব্যবস্থা করুন। কিছ্‌র বলা যায় না। পদ্মলিশের হাজত ওকে আটকে রাখার মতো শক্তি জায়গা নয়। রাজেন অধিকারী এ-স্বপ্নের এক জাদুকর বিজ্ঞানী।”

সুরজনবাবু হস্তদন্ত চলে গেলেন। আমরা সামনে বালির টিলার দিকে যাচ্ছিলাম। টিলার মাথায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে। কর্নেল ডাকলেন, “বসন্তবাবু!”

কোনও সাড়া এল না। কাছে গিয়ে আবার কর্নেল বললেন, “বসন্তবাবু। দেখা হল প্রমথবাবুর আত্মার সঙ্গে?”

বসন্তবাবু গলার ভেতর বললেন, “নাহ। দেরি দেখে প্রমথ উড়ে গেল। ওই দেখুন যাচ্ছে।”

জ্যোৎস্নার সমুদ্রের আকাশে সেই বিশাল পাখিটাকে ক্রমশ দূরে কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে দেখলাম। হালদারমশাই চমকানো গলায় বলে উঠলেন, “কী? কী?”

কর্নেল হাসলেন। “পাখি নয়, হালদারমশাই। হ্যাং গ্লাইডার।”

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের যে একটা হ্যাং

গ্রাইডার আছে। কী ভুলো মন আমার। বললাম, “কর্নেল, তা হলে মারিয়াস্মা যে ভুতুড়ে পাখির কথা বলছিল—”

আমার কথার ওপর কর্নেল বললেন, “ডার্লিং। তুমি সবই বোঝো। তবে দেরিতে। চন্দ্রকান্তবাবু কলকাতা থেকে হ্যাং গ্রাইডারে চেপে এসেছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন।”

বসন্তবাবু পা বাড়িয়ে বললেন, “যাই। ম্যাডানসায়েরের জামাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে ওর স্বশ্রুতের হিরে ফেরত দিই গে।”

কর্নেল বললেন, “হিরে উনি ফেরত পেয়েছেন বসন্তবাবু।”

“কী বললেন?” বসন্তবাবু হি-হি হো-হো করে বেজায় হাসতে লাগলেন। “হিরে ফেরত পেয়েছে? কী করে পাবে মশাই? এমন জালগায় লুকিয়ে রেখেছি, কার সাধ্য খুঁজে বের করে?”

“যাকে আপনি প্রমথবাবুর আত্মা বললেন, তিনিই খুঁজে বের করেছেন। ব্যাকওয়াটারের ওখানে একটা মন্দিরের ভেতর আপনি পড়তে রেখেছিলেন। কালো রঙের একটা ছোট্ট কোঁটোতে। তাই না?”

“সর্বনাশ।” বলে বসন্তবাবু দৌড়ে বিচে নামতে থাকলেন।

কর্নেল চোঁচিয়ে বললেন, “বরং ম্যাডানসায়েরের জামাই যে-বাংলোতে উঠেছেন, সেখানে চলে যান বসন্তবাবু।”

হালদারমশাই এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, “এখানে থাকা ঠিক না, কর্নেল সার। হেভি স্ক্রুধা পাইছে। তাছাড়া আমার সন্দেহ হয়, রাজেন অধিকারীর ভুতটা কোথাও ঘাপটি পাইত্যা-বইয়া রইছে। পদলিশ আর ধরতে পারে নাই।”

“টাম্বোকে চন্দ্রকান্তবাবু লেজার পিস্তলের একটা শটেই ছাই করে দিয়েছেন হালদারমশাই।”

“অ্যা? কই? কই?”

“কাল সকালে এসে দেখবেন। চলুন, এবার ফেরা যাক।”

কর্নেল আমাদের সোজা নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাণ্ডন মন্ড্রীমশাইয়ের সেই বাংলাতে। কুসরো অপেক্ষা করছিলেন কর্নেলের জন্য। ড্রিংগরুমে ঢুকে দেখি, বসন্তবাবু খুঁশি-খুঁশি মুখে বসে পা দোলাচ্ছেন এবং মিটিমিটি হাসছেন। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল। ডিনার টেবিলে বসে হালদারমশাই খাদ্যে মন দিলেন। কর্নেল বললেন, “বসন্তবাবু আমাদের গভরাতে ঢিল ছুঁড়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন কেন বলুন তো?”

বসন্তবাবু মদ্রগিরি ঠ্যাং কামড়ে ধরে বললেন, “ঢিল নয়। ছোট-ছোট বালির গোটা।”

“কিন্তু কেন?”

“আপনারা আমার কাজে বাগড়া দেবেন ভেবেছিলাম। বদ্বলেন না ? পদ্বলিশ এতে নাক গলাক, এটা আমার পছন্দ নয়। পদ্বলিশ যদি জানতে পারত, আমার কাছে হিরে আছে, কেলেঙ্কারি হত না ? আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম পিটিয়ে কথা বের করে ছাড়ত। ওরে বাবা ! আমি পদ্বলিশ দেখলেই কেটে পড়ি।”

“আর-একটা কথা বসন্তবাবু !”

‘বলুন। আমার মন খুব ভাল হয়ে গেছে। সব কথার জবাব দেব।”

“আপনি হিরের কথা কী জানতে পেরেছিলেন ?”

“রাজদুর কাছে প্রায়ই একটা লোক আসত। দ্দ’জনে চুপিচুপি কথা হত। আড়াল থেকে শুনতাম। পরে বদ্বলাম, কী সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে। লোকটা নাকি আমেরিকার কোনও সায়েবের কাছে জানতে পেরেছে, কুসরো-সায়েবের স্বশুর কোনও সম্মানের হিরে কিনেছেন। সেই হিরে চুরির মতলব করেছে ওরা। কী যেন নাম লোকটার ? নও...নও...দুচ্ছাই !”

কুসরো বললেন, “নওরোজিসায়েবের কিউরিও শপ আছে। বিদেশে তার অনেক চর আছে। তাদেরই কেউ খবরটা দিয়ে থাকবে—ভদ্রলোক আমার স্বশুরের চেনা লোক ছিলেন। এদিকে আমার স্বশুরও তত চতুর মানুষ ছিলেন না। মনে হচ্ছে, কোনও কথায় মদ্বখ ফসকে হিরের কথা তিনিও বলে থাকবেন। এমনকী, হিরেটা দেখিয়েও থাকবেন।”

বললাম, “নওরোজির সঙ্গে কীভাবে রাজেনবাবুর পরিচয় হল ?”

কর্নেল বললেন, “নওরোজির এক ভাই আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিজের অধ্যাপক। সেখানেই রাজেনবাবু রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। গত মাসে সেই অধ্যাপক কলকাতা এসেছিলেন। নওরোজি সেই উপলক্ষে পার্টি দেন। রাজেনবাবুও পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এসব খবর নিয়ে তবে গোপালপুরে ছুটে এসেছিলাম।

বসন্তবাবু বললেন, “রাজদুরাবর এইরকম স্বার্থপর।

কর্নেল বললেন, “নওরোজি নিশ্চয় জানতেন না, টাম্বো কৃত্রিম মানুষ। টাম্বোকে তাহলে গুলি করতেন না।”

বসন্তবাবু বললেন, “শয়তান রাজদুর নও...নও, দুচ্ছাই ! রাজদুর সেই লোকটাকে একদিন বর্গেছিল, হিরে চুরি গেছে। কে চুরি করেছে ? না—ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওই ভুতটা। কাজেই মারো গুলি ! দে বাড়ি ফেলে। হি হি হি হি। বাড়ি ফেলতে গিয়ে নিজেরই বাড়ি পড়ে গেল। হো হো হো হো...”

হালদারমশাই এতক্ষণে বললেন, “হঃ। বাড়ি পড়া স্বচক্ষে দেখাছিলাম। সে কী পড়া।”

কর্নেল বললেন, “আপনার বাড়িও পড়ে যেত। জোর বেঁচে গেছেন।”

“হঃ।” বলে হালদারমশাই জলের গ্লাস তুলে নিলেন।

গাম্ভীর্য ইনা



কলকাতা থেকে যাত্রা করার আগেই খবরটা পড়া ছিল। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের এক দৃঃসাহসী বিমান শিক্ষার্থী ইন্দুনীল রায়ের গ্লাইডারে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা একটানা উড়ে পৌঁছানো অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

বিদেশে হ্যাং গ্লাইডারে ওড়াউড়ি এখন রীতিমতো স্পোর্টস। বিশ থেকে তিরিশ ফুট পর্যন্ত একটা করে লম্বাটে ডানা—কতকটা দেখতে গঙ্গাফাড়াংয়ের মতো। প্যারাসুট কাপড়ে তৈরি। মধ্যখানে হাঙ্কা ধাতুর রড দিয়ে তৈরি একটা সামান্য ফ্রেম। সেটা আঁকড়ে একটানা অতথানি দূরত্ব অতিক্রম করা কি সম্ভব? পথে বেশ কয়েকটা বায়ুপ্রোত আড়াআড়ি পেরদতে হবে। তার ওপর ওই বিন্দ্য পর্বতশ্রেণী। গ্লাইডার তত বেশি উঁচুতে উড়তেও পারে না। অবশ্য ইন্দুনীল তাঁর গ্লাইডারে একটা ছোট্ট ইঞ্জিন ও কন্ট্রোল ব্যবস্থা ফিট করে নিয়েছেন।

তাহলেও এপর্যন্ত বিশ্বরেকর্ড বলতে ইংলিশ চ্যানেল আকাশপথে হ্যাং গ্লাইডারে পেরদনের কীর্তি রবিনসন গ্রিফিথের। কিন্তু এই বাঙালী যুবকটি যা করতে গেলেন, সেটা যেন আশ্চর্য্যের ব্যাপার। কয়েক হাজার মাইলের দূরত্ব যে!

রাজস্থানের জয়পুর থেকে ষোড়শপুরে ট্রেনে আসার পথে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় পাতায় আবার ইন্দুনীলের খবর পড়ে চমকে উঠলুম। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম, তাই ঘটেছে। ইন্দুনীল তাঁর গ্লাইডার সহ নির্খোজ হয়েছেন। তাঁর হলদে রঙের গ্লাইডার শেষ দেখা গেছে পাঞ্জাবের দক্ষিণ সীমানার ভাতিশ্ভার কাছে বিমানবাহিনীর অভ্যন্তরভেটারি থেকে।

খবরটার দিকে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। উনি চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করে ট্রেনের জানলা দিয়ে মরু অঞ্চলের পাথপাথালি খুঁজছিলেন সম্ভবত। শুধু বললেন—তাই নাকি? তারপর আবার বাইনোকুলারে চোখ দিলেন। মাঝে মাঝে অভ্যাস মতো একরাশ সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে ভুললেন না।

আমাদের—ঠিক আমার নয়, কর্নেলের গন্তব্য বারমের স্টেশনে নেমে জালোরের পথে লুদীন নদীর তীরে একটি গ্রাম সিহৌরা। বরাবরের মতো এবারও আমি তাঁর সঙ্গী। ভারত সরকারের লোকাস্ট কন্ট্রোল বোর্ড অর্থাৎ পঞ্চপাল নিয়ন্ত্রণ পর্বদ তাঁকে পঞ্চপালের প্রজননক্ষেত্রে সম্প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছেন। পাখি প্রজাপতি শোকামাকড় অমর উদ্ভিদের রহস্য নিয়ে ক্রমশ যেভাবে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মেতে উঠেছেন, আমার কেমন একটা অস্বস্তি হয় আজকাল।

ওঁর কাছেই জেনেছি, পরিযায়ী বা মাইগ্রেটরি পাখিদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে মরশুমী অভিবাসনের মতো পঙ্গপালের ঝাঁকেরও নাকি একই স্বভাব। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি থেকে শরৎকালের শেষে ওয়া আকাশ কালো করে উড়ে আসে। পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতের রাজস্থান মরু অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ওয়া আসে প্রজননক্ষেত্রের খোঁজে। সেখানে ডিম পাড়বে। ছানা পোনোগুলো পনের দিনের মধ্যেই লাগ্নেয় হয়ে যাবে। তখন খারিফ শস্যের মরশুম। শস্যের ক্ষেতে গিয়ে হানা দেবে। আকাশ কালো হয়ে যাবে। শস্যের ক্ষেত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শূন্য করে চলে যাবে অন্য এলাকায়। হেলিকপ্টারে করে বিষ স্প্রে করেও ওদের সংখ্যা কমানো যায় না। নিরক্ষর গ্রামের মানব পদুজো দিয়ে দেবতার কাছে মাথা ভাঙে। আগুন জ্বালিয়ে খোঁয়া সৃষ্টি করে এবং অনেকে ঢাকঢোল কাঁসি ক্যানেশোরা পিটিয়ে শোরগোল তুলেও পঙ্গপালের ঝাঁক তাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। পরিণামে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়।

পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ পর্যদ বারমেরায় একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখানে পঙ্গপাল নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশেষে স্দুপারিশ করেছেন, ওদের প্রজননক্ষেত্রটি খুঁজে যদি যথাসময়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়, তাহলে উৎপাত ক্রমশ বন্ধ হবে। বয়স্ক পঙ্গপালেরা ডিম পেড়েই অর্থব্ব হয়ে ক্রমশ সেখানেই মারা যায়। কাজেই ওদের ব্রিডিং ফিল্ডটি খোঁজা দরকার।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। রাজস্থানের বিশাল থর মরুভূমি এখনও দুর্গম। সারা রাজস্থানের বসতি এবং পাহাড় এলাকাতেও কোথাও ব্রিডিং ফিল্ডের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায়নি। লুনি নদীর অববাহিকায় গতবছর একটি ব্রিডিং ফিল্ড আবিষ্কৃত হয়েছিল। কর্নেল প্রথমে সেখানেই যেতে চান। তাঁর গোয়েন্দাস্বভাব অনুসারে সেখান থেকে সূত্র ধরে এগোতে চান।

যোধপুরে আমাদের জন্য জিপ অপেক্ষা করছিল। উষর ধূ-ধূ মাটি আর ন্যাড়া টিলাপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে বালিঝাড়ও চোখে পড়ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের বিকেল। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটানিতেও বেশ শীত করছিল। বারমেরা পেঁছাতে রাত আটটা বেজে গেল।

গবেষণাকেন্দ্রের অতিথিভবনে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে এবার যাত্রা শুরুর হল উটের পিঠে। আর গাড়ি চলার রাস্তা নেই। সাতটা উটের পিঠে। কর্নেল, আমি গবেষণাকেন্দ্রের দুই বিজ্ঞানী বিনায়ক শর্মা ও রাজকুমার রাণা, তাঁবু এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। দুটো বাড়তি উট নেওয়া হয়েছে সঙ্গে, যদি কোনো উট অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য।

পাথরে মাঠে, বালিঝাড়, মাঝেমাঝে ন্যাড়া পাহাড়, কাঁটাগুল্ম বা কদাচিৎ বাবলাজাতীয় গাছ—সারাপথ এই একঘেয়ে দৃশ্য। কোথাও ছাগল ও ভেড়ার

পাল চরাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা । ওরা যাযাবর । লুনি নদীর যত কাছাকাছি যাচ্ছি, তত কিছু গাছপালা, টুকরো সবুজ তৃণাঞ্চল চোখে পড়ছে ।

তিরিশ মাইল উত্তর-পূর্বে এগিয়ে বিকেল নাগাদ আমরা সিহোঁরা পৌঁছলুম । রুদ্ধ লালপাথরের টিলার ধারে একটা ছোট্ট গ্রাম । অধিবাসীরা ভীষণ গরিব । পশুপালনই ওদের জীবিকা । একটু দূরে লুনি নদীর চেহারা দেখে হতাশ হলুম । বালি আর পাথরে ভর্তি নদীর খাত । একফাঁকে সামান্য একফালি স্রোত এখনও তিরতির করে বইছে । মাচেই নাকি তা শুকিয়ে যাবে । তখন সিহোঁরার একটিমাত্র কুয়োর জলও যাবে শুকিয়ে । নদীর বালিতে গর্ত করে যেটুকু জল জমবে, গ্রামের ক্ষেত এবং তাদের পালিত পশুর দল তাই ভরসা করে বর্ষা পর্যন্ত কাটিয়ে দেবে । এমন ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রা এখানে !

কুয়োর কাছাকাছি রুদ্ধ পাথরে মাটির ওপর আমাদের ছটা তাঁবু খাটানো হল । এক সপ্তাহের খাদ্যদ্রব্য, কয়েক রকমের যন্ত্রপাতি, ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য পেস্টিসাইডসের স্টক তিনটে তাঁবুতে ঢোকানো হল । একটা তাঁবুতে কর্নেল ও আমি, অন্যটায় বিনায়ক ও রাজকুমার, বাকি তাঁবুতে গবেষণাকেন্দ্রের দুজন কর্মী । উটচালক রক্ষীরা থাকবে খোলা আকাশের নিচে । ওরা বারমের অঞ্চলেরই লোক ।

সূর্য অস্ত গেল সিহোঁরার পেছনে লাল পাথরের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে । কর্নেল কফি খেয়ে চুরট ধরিয়ে বললেন—এস ডার্লিং ! ওঁরা দেখছি খুব ক্লান্ত হয়ে জিব্বাচ্ছেন । ওঁদের আর ডেকে কাজ নেই । নদীটা একবার দর্শন করে আসি ।

বিনায়ক শর্মার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি । রোগা লম্বাটে গড়নের মানুষ । রাজকুমার আমারই বয়সী যুবক । বেশ স্বাস্থ্যবান সুদর্শন । অভিজাত রাগাংশের ছাপ চেহারায় স্পষ্ট । রাজকুমার বলল—কর্নেল, কোথায় যাচ্ছেন ?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—লুনিদর্শনে, তুমি ক্লান্ত বলে ভাবছিলুম ডাকব না । বিশ্রাম নাও ।

—কী যে বলেন ! বলে রাজকুমার উঠে এল । উঠের পিঠে আমার জন্ম বলতে পারেন ।

বিনায়ক বললেন—আপনারা নদীতে যাচ্ছেন ? ঠিক আছে । কিন্তু ওপারে যাবেন না—সন্ধ্যার মধ্যে ওপারে যাওয়াটা ঠিক নয় ।

কর্নেল অবাক হয়ে বললেন—কেন বলুন তো ?

—রাজকুমার জানে । বলবে আপনাকে । বলে বিনায়ক শর্মা ওরফে শর্মাজী ক্যাম্পচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে দুলতে শুরু করলেন ।

পা বাড়িয়ে রাজকুমার হাসতে হাসতে চাপা গলায় বললেন—শর্মাখুড়োকে দেখছেন । উনি বিজ্ঞানী হলে কী হবে ? কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ । কবে

এখানে এসে শূনে গেছেন, লুনি নদীর ওপারে ভূতের রাজ্য ।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে ওপারটা দেখতে দেখতে বললেন—ওটা কি কোনো কেল্লা নাকি রাজকুমার ?

রাজকুমার বলল—হ্যাঁ । ব্রিটিশ যুগে এই এলাকা ছিল আমার দাদু রাণা উদয়ভানুজীর রাজ্য । করদ রাজ্য আর কী ! ওই কেল্লাটা আমাদেরই পূর্ব-পূর্বরক্ষের । কয়েক পূর্বরক্ষ আগেই ভেঙেচুরে গেছে । বালির ভেতর অনেকটা ঢাকা পড়েছে ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর বালিতে নেমে গেলুম । অসংখ্য পাথর পড়ে আছে । তার ওধারে গিয়ে দেখি একজন লোক একপাল ছাগলকে জল খাওয়াচ্ছে । আমাদের দেখে সে খুব অবাক চোখে তাকিয়ে রইল । জলটায় জুতোর তলা পর্যন্ত ডোবে না । পেরিয়ে যাচ্ছি যখন, তখন সে আমাদের ডাকল—শূনিয়ে শূনিয়ে !

আমরা ঘুরে দাঁড়ালুম । কর্নেল বললেন—কিছু বলছ ভাই ?

লোকটা বলল—সায়ের ! আপনারা এখন ওপারে যাবেন না । একটু আগে আমি কেল্লার ওপাশে কাঁটার জঙ্গলে ছাগল চরাতে চরাতে হলদেবুগের একটা দানো দেখতে পেয়ে পালিয়ে এসেছি । দানোটা শূয়ে ঘুমোচ্ছে । তাই আমাকে দেখতে পারিনি । নৈলে বচন সিংয়ের দশা হত আমার !

কর্নেল হাসি চেপে বললেন—কী দশা হয়েছিল বচন সিংয়ের ?

—সে খুব ভয়ংকর ঘটনা সায়ের ! লোকটা চোখ বড় করে বললো—বচন তো বটেই, তার তিরিশটা ছাগলও মারা পড়েছিল দানোটার নিঃশ্বাসের বিষে । আর সায়ের, দানোর নিঃশ্বাস মানে কী ? প্রচণ্ড গরম ঝড় । সিহোঁরাতক এসে ধাক্কা মেরেছিল ! সব বাড়ি উড়ে গিয়েছিল । আর সে কী তাপ ! খরার সময় দুপূর্ববেলাতেও এমন তাপ দেখা যায় না !

রাজকুমার বলল—যন্তোসব ! এ অঞ্চলে এরকম আকস্মিক ঘূর্ণিঝড় কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে । আবহবিজ্ঞান সম্পর্কেও আমার কিছু জানাশোনা আছে । এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পঞ্চাশ-ষাট মাইল গেলেই কচ্ছের রান অঞ্চল শুরুর । ওখানে লুনি নদী মিশেছে জলাভূমিতে । জলাভূমির সঙ্গে আরবসাগরের যোগাযোগ আছে । মধ্য রাজস্থানের মরুতে প্রচণ্ড তাপের ফলে যখন বাতাস হাল্কা হয়ে ওপরে উঠে যায়, তখন সেই ফাঁক পূরণ করার জন্য আরবসাগর থেকে কচ্ছ পেরিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাতাস ছুটে আসে । ভূপৃষ্ঠে তাপের হেরফেরের জন্য ঝড়টা কয়েকটা কেন্দ্রে বৃত্ত হয়ে ওঠে । সেগলোকে বলব একেকটা ঘূর্ণাবর্ত ।

কথা বলতে বলতে আমরা পাথরের ওপর দিয়ে ওপারে গৌঁছে গেছি । তখনও দিনের শেষ আলো লালচে রঙে ছড়িয়ে আছে আদিগন্ত । বাঁদিকে

উত্তরে বহুদূরে বালিয়াড়ি, সমুদ্রের মতো ঢেউখেলানো অবস্থায় চলে গেছে। ডানদিকে পাথরে লাল মাটির প্রান্তর এবং কাঁটাগুল্মের জঙ্গল—তারপর পাহাড়। পূর্বে কেল্লার ওদিকে ন্যাড়া চটান জমি পাথরে ভর্তি—বহুদূর বিস্তৃত।

কর্নেল বাইনোকুলারে ওদিকটা দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—সর্বনাশ! সত্যিই তো একটা হলুদ দানো দেখতে পাচ্ছি!

প্রথমে রাজকুমার, তারপর আমি বাইনোকুলারটা নিয়ে জিনিসটা দেখলাম। কিছু বদ্বতে পারলাম না। পাথরের আড়ালে লম্বাটে হলুদ রঙের একটা জিনিস সত্যি দেখা যাচ্ছে। কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, এস তো। দেখি।

কেল্লা বাঁদিকে রেখে কিছুদূর এগিয়ে আমার মাথার ভেতর কী একটা ঝিলিক দিল। বললাম—কর্নেল! ওটা সেই ইন্দুনীল রায়ের গ্রাইডার নয় তো? ইন্দুনীল গ্রাইডারসহ নিখোঁজ হয়েছে বলে কাগজে পড়ছিলাম না?

কর্নেল হস্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। পঁয়ষাট বছরের বড়ো মানুষ এমন হাঁটতে পারেন ভাবা যায় না! কাছাকাছি গিয়েই বলে উঠলেন—হ্যাঁ জয়ন্ত! হ্যাঁ গ্রাইডার!

গ্রাইডার পড়ে আছে পরিষ্কার জমিতে। সেখানে কোনো পাথর বা কাঁটা গুল্ম নেই। মাটিটাও বালি থাকায় যথেষ্ট নরম। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, গ্রাইডারটার একটুও ক্ষতি হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে, যেন ইন্দুনীল এখানে ইচ্ছে করেই আশ্রয় নেমেছে। দুজনের মধ্যখানে এনামেল রঙের ফ্রেমে কোনো-রকমে বসার মত ছোট্ট একটুখানি আসন এবং তার তলায় ইঞ্জিন ও কন্ট্রোল বক্স অটুট আছে। কিন্তু তাহলে ইন্দুনীল কোথায় গেল?

কর্নেল বালিমাটিতে পায়ের চিহ্ন খুঁজছিলেন। আমরাও খুঁজতে শুরু করলাম। রাজকুমার তো অনেকটা চক্কর মেরে এল। এসে বলল—আশ্চর্য তো! কোথাও পায়ের ছাপ নেই। তাহলে কি ভদ্রলোক আকাশে ভেসে থাকার সময়ই দৈবাৎ কোথাও পড়ে গেছেন—তারপর গ্রাইডারটা এসে পড়ে গেছে?

বললাম—পড়লে তো ভেঙে-চুরে যেত!

—হ্যাঁ, তা ঠিক। রাজকুমার উদ্বিগ্নমুখে কর্নেলের দিকে তাকাল।

কর্নেল তখনও মাটিতে চোখ রেখে ঘুরছেন। হঠাৎ একখানে হাঁটু দুমড়ে বসে কোটের পকেট থেকে আতস কাচ বের করলেন। ওটা কি পকেটে নিজেই ঘোরেন সবসময়?

আলো কমে এসেছে। এত কম আলোয় কী সব দেখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে কে জানে! একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মাটির ওপর সূক্ষ্ম টানা-টানা অনেকগুলো আঁচড় দেখলাম।

বললাম—মাকড়সার চলাফেরার দাগ তাহলে।

রাজকুমার বললেন—ঠিক বলেছেন। মরু মাকড়সাগুলো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হয়। ঠ্যাংগুলো অন্তত ফুটখানেক করে লম্বা।

কর্নেল আবার বাইনোকুলারে চারদিক দেখছেন। আমি আর রাজকুমার দুঃসাহসী অভিনেত্রী ইন্দ্রনীর অস্তধনিরহস্য নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু করলুম। গ্রাইডার থেকে নেমে কোথায় যেতে পারে সে? কাছাকাছি বসতি বলতে সিহোঁরা। অন্যদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আর জনবসতি নেই। তাহলে?

দিনের শেষ আলো থেকে লালচে রঙটা মুছে গেছে। ধূসর হয়ে গেছে আলো। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কর্নেল বললেন—গ্রাইডারটা এখানে যেমন আছে থাক। রাতেই বরং আমরা রেডিও-মেসেজ পাঠিয়ে খবরটা জানিয়ে দেব পদলি শস্টেনে। চলো এবার কেল্লাটা একটু দেখে যাই ফেরার পথে।...

এ কিসের ডিম?

রাণা ভানুপ্রতাপের তৈরি লাল পাথরের কেল্লাটার দক্ষিণ অংশ সম্পূর্ণ বালিতে ডুবে গেছে। উত্তর অংশটা ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ফটক মদুখ খুবড়ে পড়েছে। পাথর ভিঙিয়ে ঘোরালো ফুট পনের চওড়া পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। পথটা পাথরের ইটে বাঁধানো। ভেঙে চুরে গেছে। বালি ঢুকছে ফাটলে। কর্নেল টর্চ বের করে বললেন—ভেবো না ডার্লিং! ফেরার সময় যাতে ঠ্যাং না ভাঙে, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা আছে!

আমার বন্ধ বন্ধু যেন চলমান গেরস্থালি। ওপরে কেল্লার চত্বরে পৌঁছে সারবন্দী ঘর দেখা গেল। কোনোটারই কপাট জানালা বলতে কিছু নেই। কবে কারা খুলে নিয়ে গেছে—হয়তো সিহোঁরার বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরাই। প্রাকারের ধারে গিয়ে কর্নেল বাইনোকুলার দিয়ে আবার দেখতে শুরু করলেন। আমি কল্পনা করছিলাম, একদা এই প্রকারে সশস্ত্র প্রহরীরা টেল দিয়ে বেড়াত—কেল্লার ভেতর কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাস করতেন রাণা ভানুপ্রতাপ। রাজকুমার আমার মনোভাব আঁচ করে সেইসব গল্প শোনাতে থাকল। মোগলদের অত্যাচারেই রাণা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আলোর ধূসরতা এখন ক্রমশ কালো রঙে পরিণত হচ্ছে। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—আচ্ছা রাজকুমার, ওদিকে কিছুদূরে একটা স্তম্ভ দেখলাম বালিতে মাথা উঁচু করে আছে। ওটা কিসের?

রাজকুমার বললেন—শুনছি ওটা ছিল একটা অবজারভেটরি। রাণা ভানুপ্রতাপের জ্যোতিষী শিবশংকর রাজী গ্রহনক্ষত্র দেখতেন। ওটা পঞ্চাশ-ফুট উঁচু টাওয়ারের টুকরো বালির তলায় চাপা পড়ে গেছে অবজারভেটরি।

সেদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ কী একটা ঝিকমিক করে উঠল। বললাম—

কর্নেল ! ও কিসের আলো ?

কর্নেলের চোখ পড়েছিল আমার বলার আগেই । বললেন—প্রথমে ভাবলুম বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে বৃষ্টি ! কিন্তু আকাশে মেঘ নেই । তাছাড়া শুভটার কাছে বালির ওপর বিদ্যুতের ঝিলিক ! আরে ! লক্ষ্য করছ ? রঙ বদলাচ্ছে যেন মৃদুমৃদু হৃদ !

হ্যাঁ—সুক্ষ্ম আলোর ঝিলিকটা নীল সবুজ লাল হলুদ শাদা হচ্ছে মৃদুতে মৃদুতে । রাজকুমার হতবাক হয়ে দেখাছিলেন । বললেন—আশ্চর্য তো ! এমন কোন ব্যাপার সিহোরার লোকে দেখে থাকলে নিশ্চয় জানতে পারতুম ! ওটা কী হতে পারে, বলুন তো কর্নেল ?

কর্নেল বললেন কিছু বুঝতে পারছি না । চলো তো দেখে আসি ।

টর্চের আলো ফেলে উনি আগে, আমরা দুজনে পেছনে এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা দিয়ে কেল্লা থেকে নেমে গেলুম । ভাঙা ফটকের পাথরগুলো ডিঙিয়ে চলতে চলতে রাজকুমার বলল—কর্নেল ! শুনছি এই কেল্লায় গুপ্তধন ছিল । রাণা ভানুপ্রতাপের কোনো দামী রত্ন ওখানে পড়ে নেই তো ? হয়তো কোন যুগে করা গুপ্তধন আবিষ্কার করে নিয়ে পালাচ্ছিল । সেই সময় ওখানে কীভাবে একটা রত্ন পড়ে গিয়েছিল । বাতাসের দাপটে এতদিনে বালি সরে গিয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে ?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—তুমি যে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, তাতে সন্দেহ নেই রাজকুমার । বিজ্ঞানীদের কাছে সবসময় সব ঘটনার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাই আশা করব । ডঃ শর্মা হলে হয়তো ব্যাপারটা ভুতুড়ে বলেই ব্যাখ্যা করতেন । অথচ উনি একজন প্রবীণ বিজ্ঞানী । আসার পথেও আমাকে বলেছিলেন, সিহোরা এলাকায় নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত ফেনোমেনা দেখা যায় । ঠুর বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলো বোঝা সম্ভব নয় । কারণ—

হঠাৎ উনি থেমে গেলেন । আমরাও থমকে দাঁড়ালুম । রঙবেরঙের আলোর ঝিলিক আর দেখা যাচ্ছে না ।

কর্নেল কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন—কী কান্ড ! এখান থেকে দেখা যাচ্ছে । অথচ আর একটু এগোলে আর দেখা যাচ্ছে না, তার মানে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে চোখের রেটিনায় ওই বিচ্ছুরণটা ক্রিয়াশীল । ভাববার কথা । এক কাজ করা যাক । রাজকুমার । তুমি এখানে দাঁড়াও । আমি আর জয়ন্ত এগিয়ে যাই ; তুমি চেষ্টা করে বলে দেবে ঠিক জায়গায় যাচ্ছি কি না ।

রাজকুমার দাঁড়িয়ে রইল । আমরা দুজনে এগিয়ে গেলুম । রাজকুমার চেষ্টা করে নির্দেশ দিতে থাকল ডাইনে—এবার সোজা ! হ্যাঁ, এগিয়ে যান । বাঁদিকে । না—একটু ডাইনে । হ্যাঁ—এবার সোজা । ঠিক আছে ।...

টর্চের আলোয় পাথরের কারুকার্যখচিত ফুট পাঁচেক উঁচু স্তরের পাশে

বালির ভেতর একটা সাদা জিনিস চকচক করছিল। বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড ডিম্বাকৃতি সাদা জিনিস। কর্নেল বললেন—দুহাতে তুলে দেখে ওঠাতে পারছ নাকি।

জিনিসটা তত কিছু ভারী নয়। সহজে দুহাতে তুলে ধরলুম। কর্নেল টোকা দিয়ে দেখে হাসতে হাসতে বললেন—এ কোন পাখির ডিম জয়ন্ত ? আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের দেখা সেই রক পাখির ডিম ? যদি এটা সত্যি ডিম হয়, তাহলে পাখিটার গড়ন কল্পনা করো তো !

বললুম—পাখিটা হবে অন্তত একটা ডাকোটা প্লেনের মতো। কিন্তু এটা থেকেই যে আলো ঠিকরোচ্ছে, তার প্রমাণ ?

কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন—রাজকুমার ! জিনিসটা কি দেখতে পাচ্ছ ?

রাজকুমার সাড়া দিয়ে বলল—পাচ্ছি। উঁচুতে উঠে গেছে।

আমি অতিকায় ডিমটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অতএব এটাই সেই রশ্মি বিকিরণকারী জিনিসটা। কর্নেল বললেন—চলো ডালিং ! তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। শর্মাজী প্রাণিবিজ্ঞানী। নিশ্চয় তিনি একটা কিছু হৃদিস দিতে পারবেন।

ডিম হোক, যাই হোক, জিনিসটার তাপ আছে। মরুভূমির শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় আমাকে আরাম দিচ্ছিল যথেষ্ট।...

মাস্টার ব্লিকের জন্ম

প্রাথমিক পরীক্ষা করে শর্মাজী আমাদের চমকে দিয়ে বলেছেন, ডিম্বাকৃতি বস্তুটির বহিরাবরণ সিলিকন ধাতুতে তৈরি। প্রকৃতিতে এভাবে সিলিকন পাওয়া যায় না। অতএব এটি মানুষেরই তৈরি কোনো যন্ত্র।

কিন্তু কী যন্ত্র ? আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। সূর্যোদয়ের পর ওটা তাপনিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে তাপ বাড়তে থাকে। মধ্যরাতে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। তারপর আবার কমতে কমতে ভোরবেলা ২৪ ডিগ্রি সেঃ এবং সূর্য ওঠার পর ক্রমশ তাপ ও শীতলতার মাঝামাঝি অবস্থা। রামধনুরশ্মি বিকীরণ করে সূর্যাস্তকাল থেকেই এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে তা চোখে পড়ে। কিন্তু রাত বারোটায় খুব কাছ থেকেই তা দেখা যায়। আমাদের তাঁবুর ভেতর ওই সময় রীতিমতো রামধনুর খেলা। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু তাঁবুর ভেতরে বেশ গরম। আমার সমস্যা হল, রাতের শয্যা আরামপ্রদ হলেও পাশে রামধনু নিয়ে শোয়া বড় অস্বস্তিকর।

শর্মাজীর বিশেষ ইচ্ছা, এই ‘যন্ত্রমন্ত্র’টি দিল্লিতে প্রতিরক্ষা গবেষণাগারে পাঠানো হোক। কর্নেলের তাতে আপত্তি। শর্মাজীর বক্তব্য হল, পাকিস্তান

সীমান্ত এখান থেকে বেশি দূরে নয় । সম্ভবত এটা তাদেরই কোনো ‘যন্ত্রমন্ত্র’ । অর্থাৎ শোনা কথায় স্পাইং ডিভাইস । যান্ত্রিক গুপ্তচর ।

রোডিও ট্রান্সমিশান যন্ত্রে বারমের থানায় খবর পাঠানোর তিনদিন পরে সেনাবাহিনীর একটা হেলিকপ্টার এসে হ্যাং গ্রাইডারটা ভাঁজ করে গুলুটিয়ে নিয়ে গেল । ঠুঁরা সারা তল্লাট তল্লতল খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলেন । ইন্দুনীলকে জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থায় দেখতে পান নি ।

আজগুর্বি ডিমটার কথা কর্নেলের অনুরোধে শর্মাজী ঠুঁদের ফাঁস করলেন না । কিন্তু সারাক্ষণ মুখ বেজার করে আছেন । পঞ্চম দিনে রোজকার কর্মসূচি অনুসারে কর্নেলকে নিয়ে শর্মাজী গেলেন ইতিপূর্বে আবিস্কৃত পঞ্চপাল প্রজননক্ষেত্র দেখতে । রাজকুমার তাঁবুর সামনে টেবিল পেতে এলাকার মানচিত্রের একটা চার্ট নিয়ে বসে কী সব মাপজোক করছেন আর মানচিত্রে ফুটকি দিয়ে চলেছেন । আমি ব্যাপারটার মাথামুঁছু বুঝতে না পেরে নিজের তাঁবুতে ঢুকে একটা গোয়েন্দা উপন্যাস নিয়ে বসেছি । হঠাৎ কোণায় রাখা প্রকাণ্ড ডিমটা থেকে ব্লিক ব্লিক শব্দ শব্দে চমকে উঠলুম । শব্দটা খুবই চাপা । কিন্তু কয়েক সেকেন্ড অন্তর অন্তর হতে থাকল । রাজকুমারকে ডাকব কি না ভাবছি, এই সময় ডিমটা একটু নড়ে উঠল ।

তারপর সরুদিকটা নিঃশব্দে ফেটে গিয়ে টুকটুকে লালরঙের একটা মাথা দুটো জ্বলজ্বলে নীল চোখ আর দুটো শব্দের মতো কী বেরিয়ে এল । আমি ছিটকে বেরিয়ে চেঁচাতে থাকলুম—রাজকুমার ! রাজকুমার ! শীগগির এস ।

রাজকুমার দৌড়ে এলে তাঁবুর ভেতরে ওই কাণ্ডটা দেখিয়ে দিলুম । সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

ডিমটা পুরোটাই মাঝামাঝি ফেটে বেরিয়ে এসেছে এক অদ্ভুত প্রাণী । কিংবা পাখি । অথবা পাখি ও স্থলচর প্রাণীর মাঝামাঝি জীব । না—হলফ করে বলতে পারি, এ কদাচ উট পাখির বাচ্চা নয় । নড়বড় করতে করতে দুঠ্যাংয়ে ওটা দাঁড়িয়ে গেল । পা দুটো পাখির মতো, দুপাশে দুটো ডানার মতো জিনিসও আছে । কিন্তু মুখের গড়ন কতকটা মানুষ ও প্যাঁচার মাঝামাঝি । চোখদুটো কপালের ওপর । টানাটানা চোখ । মাথাটা গোল ও চ্যাপ্টা । মাথায় লাল চুল অথবা রোঁয়া । খড়ের রঙ কালো, পা গাঢ় হলুদ ।

চঞ্চু দুটো লাল এবং চঞ্চুর গড়ন দেখেই প্যাঁচার কথা মাথায় এসেছিল । দুপায়ে দাঁড়িয়ে কিম্বুত জীবটি প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আমাদের দেখছে ।

গার্ড ও কর্মীরা দৌড়ে এসে তাম্বজব হয়ে দেখছে । রাজকুমার একজন কর্মীকে তক্ষুনি কর্নেলদের ডাকতে পাঠালেন ।

এবার জীবটি একপা একপা করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে রোদ্দুরে এসে দাঁড়াল । অর্মান তার শরীর ঝলমল করে উঠল ।

সিহোঁরা থেকে দুজন নদীতে যাচ্ছিল। তারা দৌড়ে এসে জীবটাকে দেখা মাত্র ধপাস করে পড়ে সাস্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। তারপর চোঁচিয়ে উঠল বিকটভাবে—জয়! গরুড় মহারাজ কী জয়!

তারপর তারা গ্রামের দিকে দৌড়ে গেল। একটু পরেই দেখি, গ্রাম থেকে ঢাকঢোল শিঙা কান্সি বাজাতে বাজাতে বড়োবুড়ি জওয়ান-জওয়ানি আশু-বাক্ষশুদ্ধ দৌড়ে আসছে আর গরুড় মহারাজের জয়ধ্বনি হাঁকছে। কাছে এসে তারা মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করল। তারপর যে তুমুল কান্ড জুড়ে দিল, কান একেবারে ঝালাপালা। গরুড় মহারাজ যেন এই প্রচণ্ড জগবম্পে তিষ্ঠোতে না পেরে নড়বড়ে ঠ্যাং ফেলে বিরক্ত হয়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

রাজকুমার অনেক চেষ্টায় ভক্তদের থামিয়ে বলল—ব্যাপারটা কী তোমাদের বলো তো শূনি?

গ্রামের মূখিয়া সেলাম দিয়ে বলল—হুজুর রাণাজী! ইনি হলেন বিনতা মাইজীর সন্তান গরুড় মহারাজ। আপনারা তো লিখাপড়া আদমী হুজুর। শাস্ত্রপুস্তক পড়েছেন। গরুড়জীর কথা অবশ্যই জানেন।

রাজকুমার অবাক হয়ে বলল—বুঝলুম। কিন্তু এই জীবটিকে গরুড় বলছে কেন?

বাঃ! কী বলেন রাণাজী? মূখিয়া বলল। গত বছরও একবার গরুড় মহারাজের কৃপা হয়েছিল। সেবারও উনি কেল্লার মাঠে দর্শন দিয়েছিলেন। দুম্বাটা ছিলেন। তারপর উড়ে গেলেন। অন্য একজন বলল—সেবার তিনি আরও বড় হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন। এবার উনি যে এত ছোট চেহারায় দর্শন দিয়েছেন, তার কারণ আমাদেরই কেউ পাপ করেছে।

মূখিয়া গর্জন করে বলল—কে কী পাপ করেছে, এখনই মহারাজের সামনে কবুল করো।

এক বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলল—হাঁ মহারাজ! ধনসিংয়ের ছাগলটা এমনি এমনি পাহাড় থেকে পড়ে মরেনি। আগি পাথর ছুঁড়ে তাড়া করেছিলুম। ছাগলটা ঢুঁ মেরে আমার গাগরি ভেঙে দিয়েছিল। গাগরিতে জল ছিল মহারাজ! তখন শুধার মাস!

মূখিয়া এখানেই পঞ্চায়েত ডাকার হুকুম দেয় আর কী! রাজকুমারের ইশারায় গার্ড দুজন বন্দুক উঠিয়ে তাদের হটিয়ে দিল। লোকগুলো বন্দুককে খুব ভয় পায় মনে হচ্ছিল। কোলাহল করতে করতে তারা গ্রামের দিকে চলে গেল। রাজকুমার বলল—বোঝা যাচ্ছে, এ কোনো বিরল প্রজাতির পাখি। ওরিন্হোলজি (পক্ষিতত্ত্ব) এর খোঁজ রাখে না। মাই হোক, আমরা একে আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছি।

তাঁবুর ভেতর গরুড়জী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর কোণায় রাখা

বিস্কুটের টিনের দিকে নজর যেতেই চক্ষুতে কামড়ে তুলে নিলেন এবং পায়ের নখ দিয়ে ঢাকনা খুলে বিস্কুটগুলো সাবাড় করতে থাকলেন ।

আমাদের উটওয়ালারা ভোরবেলা নদীর ওপারে কাঁটাবনে উট চরাতে গিয়েছিল । কীভাবে খবর পেয়ে উটগুলো চরতে দিয়ে ওরা দৌড়ে এল ক্যাম্পে । তারপর গরুড় মহারাজকে দর্শন করে সান্ধ্য প্রণিপাত করল । তার কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ও শর্মাজী হস্তদন্ত ফিরে এলেন ।

শর্মাজী যে জিনিসটাকে গুপ্তচর সাব্যস্ত করেছিলেন, তা থেকে এই ‘রামগরুড়ের ছানা’ বেরুতে দেখে থ বনে গেলেন । তারপর নিরাপদ দূরত্বে পরীক্ষা করার পর হতাশভাবে বললেন—প্রাণিবিজ্ঞানে এমন কোনো জীবের কথা নেই । তাছাড়া ডিমের খোলাটা সিলিকন পাত দিয়ে তৈরি, এও বিস্ময়কর । কারণ সিলিকন প্রকৃতিতে এমন বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া অসম্ভব । আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কর্নেল !

কর্নেল একটু করে এগিয়ে খাটের কোণায় চলে গেলেন । গরুড়জীর বিস্কুট খাবার শেষ হয়ে গেছে । এখন জেলির টিন খুলে চক্ষু ভুঁবিয়েছেন । চটচটে আঠালো লালরঙের খাদ্যটা ঠুঁকে একটু বিপাকে ফেলেছে । কর্নেলকে কাছে দেখে তাঁর সাদা একরাশ দাড়িতে হঠাৎ প্রকাণ্ড চক্ষু ঘষে নিলেন । সাদা দাড়ি লাল হয়ে গেল জেলির রঙে । আমরা হাসতে থাকলাম । কর্নেল একটুও বিব্রত না হয়ে গরুড়জীর কাঁধে হাত রাখলেন । মহারাজ আপত্তি করলেন না । তখন কর্নেল ঠুঁকে কাছে টেনে গুঁর মূখে জেলি পুরে দিতে থাকলেন ।

একটু পরে কর্নেল বললেন—ডঃ শর্মা ! ডিমের খোলা সিলিকনের । তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমার মনে হচ্ছে এই পাখির শরীরটাও সম্ভবত কোনো জৈব পদার্থে গড়ে ওঠে নি ।

শর্মাজী চমকে উঠে বললেন—বলেন কী !

—হ্যাঁ মনে হচ্ছে, এর শরীরও কোনো ধাতু দিয়ে গড়া !

—অসম্ভব ! বলে শর্মাজী হাত বাড়িয়ে পরীক্ষা করতে গেলেন । তখন ‘রিক রিক’ শব্দ করে গরুড়জী চক্ষুর ঠোঁটের মারতে এলেন তাঁকে । শর্মাজী আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেলেন ।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—কোনো কারণে আপনাকে পছন্দ করছে না !

শর্মাজী বললেন—ভূতের বাচ্চা কোথাকার ! যাই হোক, ওটা নরম না কঠিন ?

—কোথাও কোথাও নরম, আবার কোথাও কঠিন ।

—ডাকটা শুনছেন ব্যাটাছেলের ? রিক রিক ! যেন রেডিও ওয়েভ !

—সেটাও আশ্চর্য ! শুনুন । যেন কোড ল্যান্ডমেক্স । রিক রিক...রিক

ব্লিক ব্লিক...ব্লিক !

শর্মাজী গোমড়ামুখে বললেন— আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না । নচ্ছার পাখিটা এবেলার প্রোগ্রাম ভেসে দিল । পাঁচটা দিন তো প্রাথমিক প্রস্তুতিতেই কেটে গেল । হাতে আর মাত্র দুটো দিন ! দেখি, কী করা যায় ।

বলে উনি নিজেদের তাঁবুতে চলে গেলেন । আমি সাহস করে গরুড়জীর কাছে গেলুম । কিন্তু যেই ছদ্মে হাত বাড়িয়েছি, গরুড়জী আমাকেও শর্মাজীর মতো চঞ্চু তুলে তেড়ে এলেন । ঝটপট সরে গিয়ে বললুম—কর্নেল ! আপনাকে তো কিছু বলছে না । দিবি আদর খাচ্ছে চুপচাপ ।

কর্নেল হাসলেন শুধু । রাজকুমার বলল—আমাকে পছন্দ করে কি না দেখা যাক । বলে সে যেই এগিয়েছে, গরুড়জী জোরালো ব্লিক ব্লিক আওয়াজ দিয়ে তেড়ে এলেন । রাজকুমার হাসতে হাসতে সরে গেল ।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল তিনফুট উঁচু গরুড় মহারাজকে দুহাতে তুলে নিয়ে বললেন—শ্রীমানকে স্নান করানো দরকার । চলো জয়ন্ত, নদীতে যাই । ফিরে এসে ডিমের খোলাটা প্যাক করে রাখতে হবে ।

রাজকুমার শর্মাজীর তাঁবুতে গেছে । আমরা দুজনে চললুম নদীর দিকে । দেখলুম, স্নানে মহারাজের আপত্তি নেই । ভাল ছিটিয়ে কর্নেল তাকে স্নান করালেন । তারপর একটা পাথরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—রোদ্দুরে শুকিয়ে নাও মাস্টার ব্লিক ! ততক্ষণ আমি প্রকৃতিদর্শন করি । বলে বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন ।

পঙ্গপাল রহস্যের সূত্রপাত

পঙ্গপালের প্রজননক্ষেত্র অনুসন্ধান কর্মসূচির (ইংরেজিতে সংক্ষেপে L B F I P) মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়ান হয়েছে । এদিকে মাস্টার ব্লিক মাত্র দুদাঁনের বয়সেই পেঁয়াজ হয়ে উঠেছেন । মাথাটি তাঁবুতে ঠেকছে । দুদাঁকের চোয়াল থেকে গজানো লাল শর্দি দুটো ফুটদুয়েক লম্বা হয়ে ঝুলছে । দাঁড় নাকি ?

তার খাদ্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে । শর্মাজী বিরক্ত ! তবে কর্নেল ভেড়ার মাংস সেক খাইয়ে দেখেছেন, আপত্তি করে না মাস্টার ব্লিক । প্রজনন-ক্ষেত্রের খোঁজে বেরুলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন । এ অঞ্চলের পাহাড়ী খাদকে বলে বেহড় । বেহড়ের ভেতর আবিষ্কৃত প্রজননক্ষেত্রের মাটি পরীক্ষা করার পর যেখানে-সেখানে ওই রকম মাটি আছে, সেখানে যাচ্ছেন গুঁরা । কিন্তু পঙ্গপালের টাঁকিটিও দেখতে পাচ্ছেন না কোথাও ।

একদিন রাজকুমার ও আমি সঙ্গী হলুম কর্নেলদের । মাস্টার ব্লিক ব্লিক ব্লিক

আওয়াজ দিতে দিতে মানুষের ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছে কর্নেলের পাশে। কর্নেল তার কাঁধে হাত রেখে চলেছেন। এদিন একটা বেহুড় থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে বালিয়াড়িতে গিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড উঁচু সব বালির পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিকে আর না এগিয়ে ডাইনে ঘুরতেই লুনি নদী চোখে পড়ল। নদীর পাড়ে পাথুরে মাটিতে শর্মাজীর হাতের অনুসন্ধান যন্ত্রটি রাখতেই ব্লিক করে শব্দ হল। শর্মাজী উত্তেজিতভাবে বললেন—পাওয়া গেছে! রাজকুমার, স্প্রে মেসিনটা দেখি।

মাটিটা ওখানে ফেটে আছে। প্রকাণ্ড সব ফাটলের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে দিনদুপুরেই। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে দূরে কেলাটা দেখছিলেন। রাজকুমার স্প্রে মেসিনটা শর্মাজীকে দিল। শর্মাজী যেই বিষাক্ত তরল পদার্থ স্প্রে করতে গেছেন ফাটলের ভেতরে, মাস্টার ব্লিক ঝাঁপিয়ে গেল তাঁর দিকে। স্প্রে ফেলে শর্মাজী মাই গড বলে ছিটকে সরে গেলেন। তাঁকে তাড়া করল মাস্টার ব্লিক। শর্মাজী চেষ্টা করে উঠলেন—কর্নেল! আপনার বাঁদরটাকে সামলান! এ কী!

‘বাঁদর’ রাজকুমার আমার দিকেও তেড়ে এল। আমরা দৌড়ে তফাতে গিয়ে দাঁড়ালুম। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে ধমক দিলেন—কি হচ্ছে মাস্টার ব্লিক? এমন করছ কেন?

মাস্টার ব্লিক বলল—ব্লিক ব্লিক ব্লিক.....ব্লিক...ব্লিক ব্লিক...ব্লিক!

কর্নেল ভুরু কঁচকে তাকালেন তার দিকে! তার শৃঙ্গদুটো টানটান হয়ে খাড়া। যেন এরিয়েল বা অ্যান্টেনা। ক্রমাগত ব্লিক ব্লিক আওয়াজ করছে সে।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—চলো ডার্লিং! তোমাকে তাঁবুতে রেখে আসি। রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করে কাজ নেই। জয়ন্ত, তোমরা অপেক্ষা করো। আমি এখনি আসছি।

কর্নেল মাস্টার ব্লিককে নিয়ে বেহুড়ের পথে নেমে যাওয়ার পর শর্মাজী ‘গোমড়ামুখে ফাটলগলুর কাছ’ে এলেন। তারপর বললেন—কোনো কাজ হচ্ছে না! কর্নেলের সায়েবকে গভর্নেন্ট যে কাজে সাহায্য করতে পাঠালেন, ওঁর সে দিকে মন নেই। কাজটা যখন আমাদের দ্বারাই হবে, তখন আর কেন ওঁকে পাঠানো? নাও রাজকুমার। তুমি পাম্প করো, আমি স্প্রে করি।

রাজকুমার স্প্রে মেসিনে বার কতক পাম্প করেছেন এবং শর্মাজী নলটা ফাটলে ঢুকিয়েছেন, অর্নি ফাটলের ভেতর থেকে চাপা শিসের শব্দ শোনা গেল। শর্মাজী চমকে উঠলেন। রাজকুমারও থেমে গেল। তারপরে শিসের শব্দটা বাড়তে বাড়তে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যা ঘটল, তা আগ্নেয়াগিরির বিস্ফোরণেরই মতো। ফাটলগলু দিয়ে শনশন আওয়াজ করে বেরুতে থাকল পঙ্খপালের ঝাঁক। মৃহুতেই আমরা ঢাকা পড়ে গেলুম। কোটি কোটি

—অসংখ্য পঙ্গপাল শনশন শব্দ—এবং সেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ তো আছেই, চারপাশ ওপর-নিচ কালো করে আমাদের কবরে দেবার উপক্রম করল। শর্মাজী চোঁচিয়ে উঠেছিলেন—পালাও! পালাও! এবার তিনি পাগলের মতো মাথা মদুখ ঝাড়তে ঝাড়তে দিশেহারা হয়ে দৌড়লেন। আমরাও দিশেহারা হয়ে দৌড় দিলুম। কিছুদূর যাওয়ার পর রেহাই পাওয়া গেল। শর্মাজী তখনও দৌড়ছেন। সেই ফাটলগদুলোর ওপর যেন কালো মেঘ শনশন করছে—আর সেই শিসের শব্দ।

ক্যাম্পের একটু আগে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেছেন। মাস্টার ব্লিক ওদিকে তাকিয়ে ব্লিক ব্লিক করছে। তাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। শর্মাজী এলে কর্নেল বললেন—ভারি অশুভ তো!

শর্মাজী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—অর্থপেডেইরা গোত্রের পঙ্গপাল এগুনো! এই দেখুন একটা ধরে এনেছি। প্রজাতি হল সিস্টেসার্ক' গ্রিগরিয়া। ডেজার্ট লোকাস্ট বলা হয়। কিন্তু এদের এমন অশুভ আচরণের কথা জানা নেই।

কর্নেল ফিঙিটা ঠুঁর হাত থেকে নিয়ে বললেন—মাই গডনেস! ডঃ শর্মা! দেখুন ভাল করে, এটার দেহে যেন কোনো জৈবিক পদার্থ নেই। খাতব উপাদানে তৈরি বলে মনে হচ্ছে।

শর্মাজী পরীক্ষা করে বললেন—তাই তো দেখছি, কর্নেল। এই ঠ্যাংটা দেখুন। ভাঙ্গা যাচ্ছে না। ইম্পাতের তারের মতো। দেখুন কেমন বেঁকে রইল। অথচ ভাঙল না। আরে! এটা দেখছি ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে।

কর্নেল বললেন—এখনই বারমের রোডিও মেসেজ পাঠান ডঃ শর্মা। কোনো বিশেষজ্ঞকে আসতে বলুন। এমন কাউকে পাঠাতে বলুন, যিনি একাধারে পদার্থবিদ, ধাতুবিজ্ঞানী এবং বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সেও যার জ্ঞানগম্য আছে।

রাজকুমার বলল—অ্যাস্ট্রোফিজিক্স কেন কর্নেল?

কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন—ডার্লিং! তুমি তো একজন বিজ্ঞানী। তুমি তো জানোই যে আমাদের এ ছোট্ট মরজগতের সর্বকিছুই মহাকাশ এবং সমগ্র গ্যালাক্সির সঙ্গে সম্পর্কিত। আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন করে কোনো জিনিস সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করব। পৃথিবীতে যে প্রাণ নিয়ে আমাদের অস্তিত্ব, তারও মৌলিক উপাদান মহাকাশ থেকে মহাজাগতিক ধূলিকণার সঙ্গে একদা ভেসে এসেছিল—এমন কথাও বলছেন আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিস্টরা। এ যুগে আমরা আর শুধু পৃথিবীর সন্ধান নই। মহাজাগতিক এক বিশাল সংসারের অন্তর্ভুক্ত।।...

মাস্টার রিকের অন্তর্ধান

বিকেলের মধ্যেই হেলিকপ্টারে চেপে এলেন বিশেষজ্ঞমশাই। দেখলুম, কর্নেলের পূর্বপরিচিত তিনি। নাম পৃথিবীজিৎ সিং। পাজ্যাবের শিখসম্প্রদায়ের মানদুষ। বারমেরে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাজে এসেছিলেন। খবর পেয়ে নিজেই উৎসাহী হয়ে চলে এসেছেন। হেলিকপ্টারটা তাকে রেখে চলে গেল। সঙ্গে অনেক বস্ত্রপাতি এনেছেন ডঃ সিং। ঘণ্টাখানেক ফাঁড়ীটাকে পরীক্ষা করে বললেন—আপনারা এটাকে রোবট ভেবেছিলেন। তা নয়। ঝাঁকে ঝাঁকে এমন রোবট তৈরি করতে হলে ধনী দেশকেও ফতুর হতে হবে তিনদিনে। আসলে এটা ক্রোনিং প্রক্রিয়ায় তৈরি।

শর্মাজী বললেন—কী কান্ড! আমার মাথায় কথাটা একবার এসেছিল বটে!

—হ্যাঁ। ক্রোনিং আণবিক জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত জেনেটিক্স বা প্রজনন বিদ্যার একটি আধুনিক তত্ত্বমূলক প্রক্রিয়া। ডঃ সিং একটু হাসলেন। ডঃ শর্মী তো এসব জানেন। কর্নেলের কাছেও বিষয়টা আশাকরি অপরিচিত নয়। মনে আছে? দিল্লীতে গত বছর আপনি আমার সঙ্গে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—আচ্ছা ডঃ সিং, ক্রোনিং প্রক্রিয়ায় তো একটিমাত্র জৈব কোষকে কৃত্রিম উপায়ে বিকাশ ঘটিয়ে প্রয়োজন সংখ্যক ক্রোমোজোমের জোড়কে সাজিয়ে একটা ফর্মে আনা যায়।

—হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটা তত্ত্বের আকারেই ছিল। অথচ এক্ষেত্রে দেখাচ্ছিল কোনো কুশলী মস্তিষ্ক সেই তত্ত্বকে বাস্তবে সফল করেছেন। কে এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানী?

শর্মাজী বললেন—নিশ্চয় কোনো শত্রুদেশের বিজ্ঞানী তিনি। ভারতের শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপাল নামিয়ে দূর্ভিক্ষ সৃষ্টির চক্রান্ত এটা। তিনি বিজ্ঞানী হলেও তাকে বলব ঘৃণ্য অমানুষ। তার ফাঁসি হওয়া উচিত।

ডঃ সিং বললেন—তা তো উচিতই। কিন্তু তাঁর প্রতিভা অস্বীকার করা যায় না। সিস্টেরাসার্কি গ্রেগরিয়া প্রজাতির ফাঁড়ীয়ের একটিমাত্র দেহ কোষ থেকে তিনি ক্রোনিং প্রক্রিয়ায় একটি ফাঁড়ী সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এই ফাঁড়ীটি অতিপ্রজননশীল। তার বংশধররাও তাই অতিপ্রজননশীল হয়েছে। আমার ভাবতে আতঙ্ক হয়, এভাবে হিটলারের একটিমাত্র দেহকোষ থেকে কত অসংখ্য হিটলার তৈরি করতে পারতেন—যদি এই বিজ্ঞানী সে সময় জার্মানিতে আবিস্কৃত হতেন।

কর্নেল বললেন—এবার তাহলে আমাদের মাস্টার রিককে নিয়ে আসি। তাকেও ক্রোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে কি না দেখা যাক।

শীতের বিকেল দ্রুত পড়ে এসেছে। সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে চারদিকে।

আমরা শর্মাজীর তাব্দুর সামনে বসে কথা শুনছিলুম। মাস্টার ব্লিক কর্নেলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। একটু পরে তাকে আমাদের তাব্দুর দিকে যেতে দেখেছি।

কর্নেল তাব্দুর সামনে গিয়ে ডাকলেন—মাস্টার ব্লিক ! এস ডার্লিং।

কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ভেতরে গেলেন। তারপর ব্যস্তভাবে বোরিয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরে ডাকতে থাকলেন। কোনো সাড়া নেই ছোকরার। কর্নেল উদ্ভিগ্ন মুখে বললেন—এই তো ছিল ! গেল কোথায় সে ? তারপর বাইনোকুলারে চোখ রেখে চারদিকে তন্নতন্ন খুঁজলেন।

এইসময় সিহোরার একদল মেয়ে নদীর থেকে আসছিল। তারা খুব উত্তেজিতভাবে আসছিল। কর্নেল জিগ্যেস করলেন—তোমরা কি গরুড় মহারাজকে দেখেছ ?

তারা একসঙ্গে হইচই করে উঠল। একজন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল—গরুড় মহারাজকে এইমাত্র আমরা নদীর ওপর দিয়ে উড়ে কেল্লার দিকে যেতে দেখলুম হুজুর ! তবে তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার দেখে আমরা পালিয়ে আসছি। জল ভরতে পারিনি। খালি গাগরি নিয়ে পালিয়ে আসছি হুজুর !

—কী ব্যাপার দেখেছ তোমরা !

—কেল্লার মধ্যে দানো থাকে, তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম আমরা। হলদে রঙের একটা ‘এস্তাবড়া’ মাকড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখাছিল, হুজুর !

কর্নেল বললেন, ব্যাপারটা দেখতে হয়। জয়ন্ত, যাবে নাকি ?

আমি এগিয়ে গেলুম। রাজকুমার ও পৃথিবীজিৎ সিংও ব্যস্তভাবে সঙ্গ ধরলেন। কী ভেবে রাজকুমার একজন বন্দুকধারী গার্ডকেও ডেকে নিল। আমরা দলবেঁধে লুনি নদীর দিকে ছুটে চললুম।

নদীর কাছে আমাদের উটওয়ালাদের সঙ্গে দেখা হল। তারা উটের পাল ডাকিয়ে ব্যস্তভাবে আসছিল। ভয়াবহ কণ্ঠস্বরে বলল—ওদিকে যাবেন না স্যার ! কেল্লাবাড়িতে হলদেরঙের কী একটা দেখে উটগুলো ভয় পেয়েছে। আমরা তাই এদের ডাকিয়ে নিয়ে আসছি।

কেল্লায় গিয়ে টর্চের আলোয় তন্নতন্ন খুঁজে কোনো জনপ্রাণীটি দেখা গেল না। ‘এস্তাবড়া’ মাকড়সা কিংবা কোনো হলদেরঙের জিনিসও না। তবে কর্নেল টর্চের আলো কেল্লার চত্বরে ফেলে একখানে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। তারপর সেদিনকার মতো পরীক্ষা করে বললেন—কয়েকটা লম্বা আঁচড়ের দাগ। কিসের দাগ ?

কেল্লা থেকে নেমে সেই শুভ্রটা পর্বত আমরা গেলুম। সেইসময় আমি যেন কোথাও ব্লিক শুনলুম একবার। হয়তো কানের ভুল। তাই কথাটুকু বললুম না কর্নেলকে।

অনেকক্ষণ আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করে আমরা ক্যাম্পে ফিরে চললুম।...

মধ্যরাতের প্রলয়কাণ্ড

ক্যাম্প এ রাতে জরুরী কনফারেন্স। গরুড় মহারাজ গুরফে মাস্টার ব্লিকের সেই প্রজনন কথা অর্থাৎ ডিমের ভাঙা থোলস পরীক্ষা করে পৃথিবীজিৎ সিং সিলিকনই সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে, ওই কিভ্রুত বৃহৎ পক্ষীটিও ক্রোনিং প্রক্রিয়ায় সন্ট। সিলিকন ধাতু কম্পিউটার বা রোবোটের প্রধান উপাদান। জাপানে এ ধাতুর সাহায্যে অসম্ভব-অসম্ভব কাজ চালানোর উপযোগী যন্ত্র তৈরী সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগকে সিলিকন ধাতুর যুগই বলা হয়।

ডঃ সিংয়ের বক্তব্য শুনে কর্নেল বললেন—তাহলে আরও ডিম খুঁজে পাওয়া উচিত। পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো! কাল আমরা ওই এলাকা খুঁজে দেখব।

শর্মাজী আঁতকে উঠে বললেন—ইতিমধ্যে যদি ডিমগগুলো ফুটে গরুড়-পক্ষীর ছানা বেরিয়ে থাকে তো কেলেকারি!

রাজকুমার মূর্চকি হেসে বলল, খুঁড়োমশাইকে তাহলে বারমের থেকে পালিয়ে মাথা বাঁচাতে হবে।

শর্মাজী চটে গেলেন— বেশি বকো না। তোমারও একই অবস্থা হবে। বলে আমার দিকে কটাক্ষ করলেন।—এই সাংবাদিক ভদ্রলোককেও হতচ্ছাড়া পাখিটা পছন্দ করে না দেখছি।

কর্নেল এসব কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন—এবার বলুন ডঃ সিং, আপাতত ওই পঙ্গপালের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শীগগির একটা কিছন্ন না করলে তো মার্চ-এপ্রিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোথাও চাষাীরা ফসল ঘরে তুলতে পারবে না। সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে এই শক্তিশালী পঙ্গপাল।

পৃথিবীজিৎ একটু ভেবে বললেন—প্রতিরক্ষা দফতরে কোমিকেল রিসার্চ সেন্টার থেকে সদ্য আবিষ্কৃত মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ RRO-27 পরীক্ষার এমন সন্যোগ আর পাওয়া যাবে না। প্রয়োগ করে দেখা যাক না কী হয়। তবে—

উনি গম্ভীরভাবে চুপ করলে কর্নেল বললেন—তবে!

- ফাটলগুলোর সঙ্গে যদি নদীর ধোঁগাধোঁগ থাকে, জল বিধাস্ত হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ এখন তত জল নেই নদীতে। কিন্তু আগামী বর্ষায় জলস্রোত এসে ফাটলে ঢুকবে।

শর্মাজী উত্তেজিতভাবে বললেন—পরের কথা পরে। আগে পঙ্গপাল নিধন।...

চিন্তাভাবনার মধ্যে কনফারেন্স শেষ হল রাত বারোটা নাগাদ। তারপর আমরা শূন্যে পড়লুম ক্যাম্পখাটে। সব একটু তন্দ্রামতো এসেছে, বাইরে শনশন শব্দে ঘোর কেটে গেল। শব্দটা ঝড়ের বলে মনে হচ্ছিল। ডাকলুম—কর্নেল। কর্নেল!

কানলের নাক ডাকছিল। বন্ধ হয়ে গেল। বললেন-- কী হয়েছে ?

—ঝড় আসছে।

হুঁ, শীতের সময় আরবসাগর থেকে কচ্ছপ্রদেশ পেরিয়ে একটু আধটু ঝড়বৃষ্টি এ তম্নাটে এসে থাকে শুনছি। তোমার চিন্তার কারণ নেই। ক্যাম্পের খুঁটি ষথেষ্ট মজবুত।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল এবং চাপা গদরুগদরু গর্জন শোনা গেল। গর্জনটা একটানা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে যে বহুদূরপ্রসারী চাপা গরগর আওয়াজ শোনা যায়, ঠিক তাই। তারপরই ঝড়টা এসে ক্যাম্পের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপর কী একটা ঘটল যেন! তীর নীল বিদ্যুতের ঝলকানি, কান ফাটানো বজ্রগর্জন—পরক্ষণে দেখি খোলা আকাশের তলায় বসে আছি। ক্যাম্পখাটটা আমাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে।—কর্নেল! কর্নেল! বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপর ঝড়ের ধাক্কা উবুড় হয়ে পড়ে গেলুম। টের পেলুম, ক্যাম্পখাট এবং তাঁবুর ভেতরকার সব জিনিসপত্র উড়ে বেরিয়ে গেল। মাটিতে মুখ গর্জে পড়ে রইলুম। ওপরে প্রলয়কাণ্ড চলতে থাকল। সেই ব্যাপক গরগর চাপা গর্জন এখন আমার চারদিকে।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ—যেমন শিসের শব্দ পঙ্গপালের ব্রিডিং গ্রাউন্ডে ফাটলের ভেতর শুনোঁছি, তার লক্ষ্যগুণ বেশি জোরালো শব্দটা কানের ভেতর দিয়ে সর্দিচের মতো মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছিল। অসহ্য লাগাতে দুকানের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে পড়ে রইলুম।

পরে শুনলুম, এই সর্বনাশা ঝড়ের স্থিতিকাল ছিল মাত্র তিনমিনিট।

ঝড় থামলে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে ডাকলুম—কর্নেল! আপনি কোথায়?

কর্নেলের সাড়া পেলুম আমার পাশ থেকে।—আছি, জয়ন্ত! এবার উঠে পড়ো! ঝড় থেমে গেছে।

এবার একটা অশুভ ব্যাপার চোখে পড়ল। চারদিকে কেমন একটা নীলচে রঙের আলো। অথচ আকাশ পরিষ্কার। কৃষ্ণপঙ্কের এক টুকরো চাঁদ লুনি নদীর ওপর দক্ষিণপূর্ব আকাশে ঝুলে আছে। আবহাওয়া শীতের বলে মনে হচ্ছে না—যেন গ্রীষ্মরাতের। ফলে গরম সোয়েটারের ভেতর দরদর করে ঘামছি।

মিনিট খানেকের মধ্যে নীলচে আভাটা মিলিয়ে গেল। তাপটাও কমতে কমতে আবার মরুভূমির শীত এসে হাজির হল। কর্নেল টর্চ জেলে শর্মাজীদের খুঁজছিলেন। দেখলুম, একে একে ওঁরা হামাগুড়ি দিতে দিতে দুপায়ে সোজা হচ্ছেন এতক্ষণে। ওঁদিকে উটওয়ালাদেরও কথাবার্তা শোনা গেল। লস্টন জরুরিতে দেখলুম।

জেনারেলেরটা নষ্ট হয়ে গেছে কোনো অজ্ঞাত কারণে। কিছুতেই আর সেটা চালু করা গেল না। পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বালা হল। তারপর পেছনের পাথরের

স্তুপে আটকে থাকা তাঁব, ক্যাম্পখাট এবং জিনিসপত্র সবাই মিলে বয়ে আনলুম।

সিহোঁরা থেকে কান্নাকাটি ও কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। আলো নিয়ে ছোটোছোটো করে বেড়াচ্ছিল গ্রামবাসীরা। আমাদের ক্যাম্পগুলো আবার সাজিয়ে নিতে নিতে ভোর চারটে বেজে গেল। উত্তর থেকে এখন প্রচণ্ড হিম মরুবাতাস এসে হাড় কাঁপিয়ে তুলছে। ..

মাস্টার রিকের খোঁজ মিলল

ক্যাম্পের সব যন্ত্রপাতি নিশ্চয় হয়ে গেছে। রেডিও ট্রান্সমিশন অচল। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। সকালে ক্ষয়ক্ষতি লক্ষ্য করতে গিয়ে সবাই চোখে পড়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বস্তুর কোনো ক্ষতি হয় নি। শব্দ মানুষের তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট যা কিছু, তাকেই বিশৃংখল করে গেছে ওই অদ্ভুত ঝড়। সিহোঁরা গ্রামের ঘরগুলো পাথরের। বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু গৃহপালিত পশুরা অক্ষত নেই। অনেক মারা পড়েছে। অনেক পশু জখম হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, যে বড়ি ধন সিং নামে একটা লোকের ছাগলের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, শব্দ সে বেচারী মারা পড়েছে ঘর ধসে। ঢাকঢোল শিঙা কাঁস বাজিয়ে গ্রামবাসীরা গরুড় মহারাজের পূজা দিচ্ছিল শ্মশান থেকে ফিরে।

শর্মাজী খুব ভয় পেয়ে গেছেন। ভোরবেলা মান করে চলে গিয়েছিলেন সিহোঁরা গ্রামের মন্দিরে প্রণাম করতে। তারপর গ্রামবাসীর দলে ভিড়ে গেছেন। পৃথ্বীজিৎ সিং অচল রেডিও ট্রান্সমিশন নিয়ে বসে গেছেন। তাঁকে সাহায্য করছে রাজকুমার।

কর্নেল আমাকে ডেকে নিয়ে নদী পেরিয়ে কেল্লার দিকে চললেন। পথে যেতে যেতে বললেন—তিনটে ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। এক : ঝড়টা ছিল শব্দকনো—বৃষ্টিহীন। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। দুই : ঝড়ের সময় প্রথমে চাপা গরগর শব্দ, তারপর তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দ। তিন : ঝড়ের পর কিছুক্ষণ নীলচে আভা। আমি ওই সময় চাঁদের দিকেও লক্ষ্য করছিলাম। চাঁদটা পর্যন্ত নীলচে দেখাচ্ছিল।

ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, কাল সন্ধ্যায় কী একটা হলদে জিনিস দেখে উটগুলো ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া গ্রামের মেয়েরা নাকি কেল্লার ওপর দানোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল—দানোটা দাঁড়িয়ে ছিল হলদে রঙের মাকড়সার পিঠে।

কর্নেল চিত্তভাবে বললেন—মাকড়সা! প্রথমদিন বিকেলে ওখানে মাটির ওপর স্ফুস্প লম্বাটে আঁচড় দেখেছি আতসকাচের সাহায্যে। রাজকুমার বলছিল এ এলাকায় সরু মাকড়সাগুলো প্রচণ্ড হয়। আঁচড়গুলো যদি মাকড়সার পাকের হয়, তাহলে বলব, মাকড়সাটা একটা মোটরগাড়ির মতো বড়। কিন্তু গোলাকার।

আমার মাথার ভেতর ঝিলিক দিল একটা কথা। বললুম—কর্নেল!
জিনিসটা স্পেসশিপ নয় তো?

কর্নেল হাসলেন।—ডার্লিং! স্পেসশিপ বলতে কি তুমি অন্য কোনো
গ্যালাক্সির প্রাণীদের দিকে ইঙ্গিত করছ?

—কেন? অসম্ভব কিসে?

—অন্য গ্যালাক্সির চেয়ে আমাদের গ্যালাক্সিতেই এমন অসংখ্য রহস্য আছে
জন্ম, যা আমাদের চক্ষু ছানাবড়া করার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া এখনও এই
গ্যালাক্সি ছাড়া অন্যত্র প্রাণ আছে কিনা আমরা জানি না। বৃথা কল্পনায় লাভ
নেই। তার চেয়ে—

হঠাৎ থেমে উনি বাইনোকুলারে কী দেখতে থাকলেন কেল্লার দিকে।
তারপর হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। জিগ্যেস করেও কোনো জবাব
পেলুম না। কেল্লার কাছাকাছি পৌঁছে কানে এল রিক রিক শব্দ। চমকে
উঠলুম। কর্নেল এখন দৌড়তে শুরু করেছেন। বড়োর নাগাল পেতে
আমার মতো জোয়ানের হাঁফ ধরে যাচ্ছিল।

কেল্লার উঠে চক্রে ঢুকেই দেখি, মাস্টার রিক কাত হয়ে পড়ে আছে।
কর্নেলকে দেখে সে ডানাদুটো নেড়ে কাতরভাবে রিক রিক করতে থাকল।
কর্নেল তাকে দূরহাতে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন। মাস্টার রিক অনেক
কণ্টে দাঁড়াল। তারপর কর্নেলের বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে প্রকাশ্যে চক্ষু ফাঁক
করল। কর্নেল পকেটে হাত ভরে একগাদা বিস্কুট বের করে ওকে খাওয়াতে
থাকলেন। বললেন—ঠিক এমন কিছু অনুমান করেই বিস্কুটগুলো
এনেছিলুম। জন্ম আমার কোটের পকেটে জেলির টিন এঁেছি। বের করে দাও।

তা করতে গেলে হতচ্ছাড়া রিক চোখ ট্যারা করে তাকাল আমার দিকে।
কিন্তু ওর চক্ষুর ভেতর বিস্কুট। তাই ঠোঁটের মারবার চেষ্টা করল না। রাগ
করে বললুম—আমাকে কেন দেখতে পারে না বলুন তো? অথচ ও যখন
ডিমের ভেতর ছিল, তখন আমিই ওকে এতটা পথ বয়ে নিয়ে গিঁছি। নেমকহারাম
কোথাকার!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—ক্রোনিং প্রক্রিয়ায় জন্ম হলেও মাস্টার রিকের
মধ্যে স্বাভাবিক জৈব সহজাত বোধ রয়েছে। মানবের জীবরা সেই বোধের
সাহায্যে ঠিকই টের পায়, কে তাদের পছন্দ বা অপছন্দ করছে। তুমি নিশ্চয়
ওকে অপছন্দ করো, ডার্লিং!

—ঠিক অপছন্দ নয়। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে ওর গায়ের গন্ধে।

—মাস্টার রিক কাল রাতের ঝড়ে আহত হয়েছে। ওকে একটু আদর করো।
দেখবে আর তোমাকে ঠোঁটের মারতে চাইবে না! নাও, জেলিটা খাইয়ে দাও ওকে।

ভয়ে ভয়ে কোটো থেকে খানিকটা জেলি নিয়ে ওর চক্ষুর ভেতর গুঁজে
দিলুম। ডানায় ও লাল টুকটুকে চ্যাপ্টা মাথায় হাত বুলিয়েও দিলুম, কর্নেল

ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে চত্বরে কী সব তদন্ত শুরুর করলেন। কয়েক গ্রাস খেয়ে মাস্টার রিক হঠাৎ এঁটো চক্ৰটা আমার সোয়েটারে ঘষতে থাকল। জেলিতে মাখামাখি হয়ে গেল। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললুম—তবে রে রাম গরুড়ের ছানা!

মাস্টার রিক রিক রিক করে যেন হাসল। নড়বড়ে ঠ্যাংয়ে এবার টাল সামলে খাড়া হতে পারল সে। কর্নেল বললেন—জরুর, তোমার অনুমান আংশিক সত্যি হতেও পারে। যে হলদেরঙের মাকড়সার কথা আমরা শুনছি এবং তুমি যাকে স্পেসশিপ বলেছ, সেটা সত্যিই স্পেসশিপ। এখানেই ওটা নেমেছিল। তবে অন্য গ্যালাক্সির নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি যে সেই উড়ুন্ধু গাড়িটি গত রাতে ইচ্ছে করেই আমাদের ক্যাম্পের ওপর ঝড় সৃষ্টি করে গেছে। সব রহস্য ওতেই কেন্দ্রীভূত।

—বলেন কী! কী করে বুঝলেন?

—তথ্য থেকে ডিডাকশান করে। কর্নেল চুরট ধরালেন। —কাল সন্ধ্যার মধ্যে উড়ুন্ধু গাড়িটাকে এখানে গ্রামের মেয়েরা দেখেছিল। কিন্তু তার আগে কোনো ঝড় হয় নি।

মাস্টার রিক নড়বড় করে হেঁটে প্রাকারের ধারে গেল। তারপর বারবার রিক রিক করে করে ডাকতে থাকল! কর্নেল এগিয়ে বললেন—কী হয়েছে মাস্টার রিক?

বলে তিনি চোখে বাইনোকুলার রেখে পূর্ব-উত্তর দিকের মরুভূমির বালিয়াড়ি দেখতে থাকেন। একটু পরে অস্ফুটস্বরে বললেন—কাকে যেন দেখলুম বালিয়াড়ির আড়ালে।

বালিয়াড়ির মাথায় এখনও ধূসর কুয়াশা আলোয়ানের মতো জড়ানো রয়েছে। আমি কিছুর দেখতে পেলাম না। ওদিকটা দিগন্ত অগ্নি ধূসর হয়ে আছে—মাইলের পর মাইল বালির সমুদ্র। থর মরুভূমির দক্ষিণ অংশটা বৈকে পদুবে ঘুরে আবার দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল চওড়া একটা ফালির মতো এগিয়ে কচ্ছ প্রদেশের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। মানচিত্রেই দেখেছি এটা। ক্রমশ না কি আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে মরুভূমি। প্রতিরোধের জন্য সরকার অজস্র প্রকল্প করেছে। কচ্ছের অন্তর্গত রানের জলাভূমি এলাকা থেকে এই সিহোঁরা পর্যন্ত কোনো জনপদ নেই। কাজেই ওদিকে কোনো মানুষ বাস করে না। গাছপালা দূরের কথা একটা ঘাস পর্যন্ত গজায় না।

শুধু লুনার নদীর দুধারে কিছুর সবুজের চিহ্ন। স্ক্যাটে রুন্ধু গাছ আর কাঁটাগুন্ম গজায়। নদীটা গিয়ে রান জলাভূমিতে পড়েছে।

কর্নেল অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—নাঃ! চোখের ভুল। চলো, ক্যাম্প ফেরা যাক। মাস্টার রিকের শ্রদ্ধা করা দরকার। কাল রাতের ঝড়ে বেচারার ঘায়েল হয়ে পড়েছে।...

বন্দী অথবা অভিজি

মাস্টার ব্লিকের পুনরাবির্ভাবে শর্মাজী এত খচে গেলেন যে কিচেন ক্যাম্পে গিয়ে বসে রইলেন সারা বেলা। পৃথিবীজি তার কাছ ঘেঁষতে সাহস পেলেন না। একটু দূর থেকে দেখে রায় দিলেন—এও ক্রেনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। তবে এটুকু বলা যায়, পেঁচা এবং ঈগলের দেহকোষ মিশ্রণে এই বিদ্যবদূটে পাখিটির উদ্ভব ঘটেছে। বিশেষ সংখ্যক ক্রোমোজোম জোড় সাজিয়ে একটা ফর্ম আনা হয়েছিল মিশ্রিত কোষটিকে। তারপর সিলিকনের পাত দিয়ে ডিম তৈরি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিহোঁরাবাসীদের পদজোর ঘটায় আমাদের কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছিল। মাস্টার ব্লিককে বাইরে একটা খুঁটি পুতে ঠ্যাংয়ে নাইলনের দাঁড়ি বেঁধে রাখতে হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবিতে আর তাকে ক্যাম্পের ভেতর ঢোকানো যায় নি। নির্বিকার ভঙ্গীতে ‘গরুড় মহারাজ’ পদজোর প্রসাদ খেয়ে চলেছেন। তারপর দূটো ভেড়াও বলি দেওয়া হল। আতঙ্কে দেখলুম, মাস্টার ব্লিক চঞ্চু এবং পায়ের সাহায্যে কাঁচা মাংস শকুনের মতো ভক্ষণ করছে। কর্নেল ওকে সেন্নে মাংস খাওয়াতেন। রাজকুমার অবাক হয়ে বলল—এরকম পেটুক কখনও দেখি নি। দূটো ভেড়া হজম করতে পারবে তো ?

বিকেল নাগাদ পদজোর খুমখাড়া ক্রান্তি শেষ হল। স্বস্তি পেয়ে ক্যাম্প ঢুকে সবে একটু গড়াতে গেছি, বাইরে কর্নেলের চিৎকার শুনলুম—মাস্টার ব্লিক ! মাস্টার ব্লিক !

বেরিয়ে গিয়ে দেখি, নাইলনের মজবুত রশি ছিঁড়ে মাস্টার ব্লিক দৌড়ে চলেছে। কর্নেলও দৌড়ছেন পেছনে পেছনে। তারপর ডানা মেলে পাখিটা। নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল কেল্লার দিকে। দূটো ভেড়া খেয়ে ওর গায়ে জোর ফিরে এসেছে বেড়েও গেছে সন্দেহ নেই।

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। তারপর ঘুরে ঈশারা করলেন আমাদের যেতে। কাছে গেলে বললেন—কেল্লায় থাকতে মতলব ওর। এস তো দেখি, আবার ধরে আনতে পারি নাকি।

কেল্লার কাছাকাছি গিয়ে সকালের মতো ওর ব্লিক শুনতে পেলুম। চতুরে পেঁচিছে দেখলুম, ডানা খুঁটছে—একটা ঠ্যাং অন্য ঠ্যাংয়ের হাঁটুতে আঁকড়ানো। অবিকল বকের ভঙ্গীতে।

কর্নেল ডাকলেন—মাস্টার ব্লিক !

পাখিটা হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে মৃদুগির মতো মাটিতে বসে পড়ল। তারপর চাপা হুইসলের শব্দ শোনা গেল। কর্নেল চমকে উঠলেন—সর্বনাশ ! আবার সেই ঝড় আসছে নাকি ?

শনশন হল। বিদ্যুৎগতিতে পূর্বদিক থেকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে

হলুদরঙের বিশাল মাকড়সার মতো একটা জিনিস এসে চত্বরে আমাদের সামনেই নামল। মদুহর্তে বদ্বলদুম, এটা স্পেসশিপ—কর্নেলের বর্ণিত উড়ুদু গাড়ি। শিস ও শনশন শব্দ থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ওপরের ঢাকনাটা নিঃশব্দে খুলে ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল আপাদমস্তক আঁটা কালো পোশাকপরা একটা মূর্তি। তার চোখে কালো চশমা।

সে একলাফ নেমে আমাদের সামনে এসে ইশারা করল উড়ুদু গাড়িটাতে চাপতে। তার হাতে একটা পিস্তলের মতো জিনিস। নলের মদু দিয়ে রঙবেরঙের ঝিলিক বেরুচ্ছে।

কর্নেল আশ্তে বললেন—চলো জয়ন্ত! বাধা দিলে লেসার পিস্তল ছুঁড়তে পারে।

রহস্যময় আগন্তুক হলুদ গোলাকার গাড়ির ওপর একটা বোতাম টিপতেই একটা সিঁড়ি নেমে এল নিঃশব্দে। আমরা উঠে গিয়ে ওপরকার সুড়ঙ্গের মতো দরজা দিয়ে ভেতর ঢুকে গেলুম। ভেতরে চারজন বসার মতো বৃত্তাকারে সাজানো আসন রয়েছে। আমরা বসলে লোকটা মাস্টার ব্রিককে তুলে নিয়ে এল। তাকে মেঝের চেপে বসিয়ে দিল। তারপর চশমা খুলে আমাদের দিকে ঘুরে একটু হেসে বলল—আদেশ পালনের জন্য ধন্যবাদ। এবার কোমরে সিটবেল্ট বেঁধে নিন। কর্নেল কথা বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু তখন লোকটা আবার চশমা পরে মদু ঘুরিয়ে নিয়েছে। তারপর হিশ্ করে একটা শব্দ হল। তারপর শিস এবং শনশন আওয়াজ। পাশের ছোট্ট বৃত্তাকার জানালা দিয়ে দেখলুম আমরা আকাশে চলে এসেছি। অস্ত্রাঘাত ভয়ে বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে।

মাত্র মিনিট তিনেক হয়েছে কিনা সন্দেহ। শেষ বেলার আলোর নিচে সমুদ্রের মতো বিস্তীর্ণ জল চোখে পড়ল। তারপর আবার শিসের শব্দ, শনশন আওয়াজ—তারপর দেখি আমরা জলে নেমেছি। তরতর করে জল ছুঁয়ে ছুটে চলেছে একটা জলমাকড়সার মতো এই অদ্ভুত গাড়িটা। একটুও জল ছিটকে পড়ছে না। জলে দাগ কাটছে না। মনে হল, এটার যেন কোনো ওজনই নেই। তাই মাটিতে কোনো চিহ্ন খালিচোখে দেখা যায় নি। কর্নেলকে আতসকাচ ব্যবহার করতে হয়েছিল। ওজন নেই বলে মাকড়সার ঠ্যাঙের মতো আঁকসি বের করে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকে।

সামনে সবুজ রেখা ফুটে উঠল। দ্বীপ সম্ভবত। বেলাভূমির বালির ওপর পিছলে উঠে পড়ল গাড়িটা। তারপর এগিয়ে চলল তের্মনি তরতরিয়ে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলুম, গাড়িটার ঠ্যাং আছে মাকড়সার মতো। পথ বলতে কিছু নেই। চড়াইয়ে উঠে গেছে সমতল মাটি। দূধারে জঙ্গল উঁচু সব গাছ। একখানে থেমে গেল গাড়ি। লোকটা বলল—আসুন গরীবের পর্ণকুটিরে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি বনের ভেতর একটা জীর্ণ পাথরের বাড়ি—দেখতে

কেল্লার মতো। মাথার ওপর গাছপালা বলে আবছা আঁধার ছমছম করছে। লোকটার আঙুলের ডগায় আলো ফিট করা আছে। সেই আলোর ওর পেছনে পেছনে হেঁটে চললুম। ওর কোলে মাস্টার রিক চুপচাপ বসে আছে। ঠ্যাং বদলেছে।

অপর্যায়ী শান্তি মৃদু

জীর্ণ বাড়িটা পাথরের। ভেতরে ঢুকে এক জায়গায় নেমে লোকটা জুতোর ডগা দিয়ে কিসের ওপর চাপ দিল। টুং করে শব্দ হল কোথাও। তারপর দেখলুম, ঘরটা আলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে একটা রেলিংঘেরা চোকোণা ইঁদারার মতো গর্ত রয়েছে। একটু পরে সেই গর্ত থেকে উঠে এল লিফট। লিফটের দরজা খুলে লোকটা বলল—আসুন।

লিফটে চেপে আমরা এবার যেখানে নামলুম, সেটা একটা সাজানো গোছানো সুন্দর হলঘর। উজ্জ্বল আলোয় ভরা। একদিকে বসার চেয়ার টেবিল, শোবার খাট, বইয়ের র্যাক অনেকগুলো। অন্যদিকটায় বিচিত্র সব শব্দপাতি, টিভি পর্দাসম্বিত কম্পিউটার কয়েকটা, তার ওপাশে ল্যাবরেটরি। একটা লম্বা টেবিলের ওপর কাচের কফিন। কফিনের ভেতর একটা আস্ত মড়া। ভয়ে ভয়ে সেইদিকে তাকিয়ে আছি, লোকটা একটু হেসে বলল—ওটা মৃত মানুষ নয়। সম্পূর্ণ জীবিত। তবে অজ্ঞান অবস্থায় রাখা হয়েছে। আপনারা বসুন দয়া করে।

সে মাস্টার রিককে দাঁড় করিয়ে আমাদের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল...যাও হে। কুটুম্বদের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো। আর শুনুন, আপনাদের সেবার কোনো ত্রুটি হবে না। কিন্তু সাবধান, আসন ছেড়ে নড়বেন না। তাহলে আপনাদের বিপদ হবে। আমি আমার স্পাইডারশিপের ব্যবস্থা করে এখনই ফিরে আসছি।

স্পাইডারশিপ! মাকড়শাঘান। ঠিক তাই বটে। গাড়িটার চাকা নেই। ঠ্যাং বাড়িয়ে ঠিক মাকড়সার মতো দৌড়ে যায় এবং জলের ওপর জলমাকড়সার মতোই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যেতে পারে। আবার আকাশেও রকেটের মতো অবিস্রাস্য গতিতে উড়ে চলে। খেলোয়াড়দের ডিসকাস থ্রোয়িংয়ের মতো ব্যাপারটা।

কর্নেল গম্বীর মুখে চারদিক লক্ষ্য করছিলেন। মাস্টার রিক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একবারও আর রিক করছে না। কোথায় যেন খুবই চাপা শোঁ শোঁ শব্দ, মাঝে মাঝে রিক্ রিক্, কখনও খুট্ খাট্, যান্ত্রিক শব্দ। বদ্বতে পারছিলাম এক আধুনিক বিজ্ঞানীর গোপন আখড়ায় এসে পড়েছি।

রিক্...ঠং...খুট্ খুট্ শব্দ। তারপর দৌঁখ ওপাশের দরজা খুলে গেল এবং একটা আস্ত ক্ষুদ্রে রোবট গদাইলস্কারি চলে হেঁটে আমাদের সামনে এসে

দাঁড়াল। তার বদকে ছোট্ট টিভি পর্দায় নীল-লাল রেখা কাঁপতে কাঁপতে ফুটে উঠল : ‘পেটের নীল বোতাম ছুঁলে কফি, লাল বোতাম ছুঁলে চায়ের লিকার। চিনি এবং দুধের প্যাকেট আমার বাঁ পকেটে।’

বলা বাহুল্য, সবই ইংরেজিতে লেখা। কর্নেল নীল বোতাম ছুঁতেই তার তলপেটের নীচে একটা ট্রে বেরিয়ে এল। তাতে একটা পেপার কাপ ভর্তি কফির লিকার। কর্নেল আবার বোতাম ছুঁলেন। আরেক কাপ কপি ট্রেতে পড়ল ঠকাস করে। তারপর রোবটের পকেট থেকে দুটো ছোট্ট দুধ আর দুটো চিনির কিউব ভরা প্যাকেট তুলে নিলেন। একটু হেসে বললেন—মাস্টার ব্লিক, তোমার খাদ্য আমার পকেটে আছে। দিচ্ছি।

রোবটের বদকের পর্দায় ফুটে উঠল লাল হরফে : ‘শান্তিস্বরূপ পাখিটাকে কিছূ খেতে দেওয়া হবে না।’

রোবোটটা চলে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন—মাস্টার ব্লিক, আমি নাচার ডালিং।

মাস্টার ব্লিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বিরসবদনে। একটু পরে সেই লোকটাই ফিরে এসে টেবিলের সামনের আসনে বসল। তারপর কালো চশমা খুলে একটু হেসে বলল—আশাকরি কোনো অসুবিধে হয় নি ?

কর্নেল বললেন—না। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে মাননীয় গৃহকর্তার পরিচয় কী ?

—আমি একজন বিজ্ঞানী।

নিশ্চয় তাই। কিন্তু তার বাইরেও আপনার একটা পরিচয় আছে।

—তার আগে কি আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না কেন আপনাদের নিয়ে এলুম ?

—করছে। কিন্তু প্রথমে জানতে ইচ্ছে করছে আমরা কোথায় আছি ?

—কচ্ছের রান জলাভূমির এক দুর্গম দ্বীপে। লোকটা একটু হাসল আবার।

—আপনাদের নিয়ে আসার কারণ, আপনারা একটা ডিম চুরি করেছিলেন !

কর্নেল আপত্তি করলেন—চুরি কেন ? ডিমটা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সিহোঁরা কেল্লার কাছে।

—কিন্তু একথা নিশ্চয় জানেন, না বলে অন্যের জিনিস নিলে সেটাই চুরি ?

—আসলে আমরা ওটা কোনো প্রাকৃতিক বস্তু ভেবেছিলাম !

লোকটা চটে গেল।—প্রাকৃতিক বস্তুর জিনিস ? বাজে কথা বলবেন না।

কর্নেল বিনীতভাবে বললেন—অজ্ঞতার জন্য এ অপরাধ করে ফেলেছি। ক্ষমা চাইছি।

লোকটার মুখে গর্ব ফুটে উঠল।—যাই হোক, আমার দ্বিতীয় পরীক্ষাও সফল হয়েছে। পৌরাণিক গরুড়ের জন্ম সম্ভব হয়েছে। গতবছর যে গরুড়-

পাখির উত্তর ঘটেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে কসমিক ঝড়ের তাণ্ডবে সে মারা পড়েছিল ।
এবার—

কর্নেল চমকে উঠে দ্রুত বললেন—পৃথিবীতে কসমিক ঝড় ? সে তো মহাকাশের ঘটনা ।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল—হ্যাঁ । সুর্ষের কেন্দ্রে ওই ঝড় কোথা থেকে এসে থাক্তা মারে । সুর্ষের আয়তন বেড়ে যায় । কিন্তু গত একটা বছর ধরে লক্ষ্য করছি, এক বর্গমাইল আয়তনের একটা কসমিক ঝড় এসে পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে । আগের রাতেও ঝড়টা এসেছিল । তাই আমি এই দ্বিতীয় গরুড় পাখিটির জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম । তবে এ যে বেঁচে আছে, তার প্রমাণ অবশ্য পাচ্ছিলাম । এর জন্মের আগে থেকে ভ্রূণকোষে ধনিসংকেত পাঠানোর ব্যবস্থা করা ছিল এবারে ।

—হুঁ, ওই ব্লিক্ ব্লিক্ ডাকটা ।

—ঠিক ধরেছেন । আপনাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে ।

—ওই শব্দেই ওর নাম রেখেছি মাস্টার ব্লিক ।

লোকটা হাসতে লাগল ।—আপনি মশাই বড় রসিক দেখছি । মাস্টার ব্লিক !

কর্নেল সিরিয়াস ভঙ্গীতে বললেন—কিন্তু কেন কসমিক ঝড় এসে পৃথিবীতে আঘাত হানছে—এবং বেছে-বেছে ঠিক সিহোঁরা এলাকায় ? এ সম্পর্কে কি কিছু ভেবে দেখেছেন ? আমাদের লোকাস্ট প্রজেক্টের ক্যাম্প সব যন্ত্রপাতি অচল করে দিয়েছে ওই ঝড় । তাছাড়া তীক্ষ্ণ হুইসল্ আর একটা নীল আভা !

লোকটা গম্ভীর হয়ে কী ভাবল । তারপর বলল—আপনি লক্ষ্য করেছেন তাহলে । ঝড়টা মাঝে মাঝে এই দ্বীপেও হানা দেয় । ভাগিস মাটির তলায় এবং বিশেষ নিরোধক ব্যবস্থা থাকায় আমার ল্যাবোরেটর এখনও অক্ষত রয়েছে । এটা আসলে বোলশতকে তৈরি পতুর্গীজ জলদস্যুদের ঘাঁটি । মাটির তলায় এই ঘরটায় ওরা আরবসাগর থেকে বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠ করে এনে সব দামী জিনিস লুকিয়ে রাখত ।

কর্নেল হঠাৎ বললেন—আপনি জেনেটিস্ক বিজ্ঞানী । ক্লোনিং তত্ত্বকে বাস্তবে সফল করতে পেরেছেন । তার প্রমাণ লুনি নদীর ধারে বেহোড় এলাকায় ফাটলের ভেতর ওই পদ্মপাল ! আরও প্রমাণ এই মাস্টার ব্লিক । কিন্তু কেন আপনি গোপনে গোপনে এসব করছেন ?

—কেন ? বিজ্ঞানীর চোখদুটো জ্বলে উঠল ।—আপনাদের আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি । মৃত্যুর আগে সব কথা জেনে যেতে পারবেন ।

শব্দে আমার মাথার খুলির ভেতরটা শূন্য হয়ে গেল এবং একটা ঠান্ডা ঢিল গড়িয়ে গেল যেন । আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলুম । কর্নেল নিঃশব্দ চোখে

তাকিলে রইলেন লোকটার দিকে ।

সে নিষ্ঠুর মূখে আবার বলল—আর মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা আপনাদের আয়ু । কারণ আমার আরও একটা ক্রোনিং প্রক্ৰিয়ার সাফল্য আপনাদের দেখিয়ে তাক লাগাতে চাই । সেই বিস্ময় নিয়েই আপনাদের মৃত্যু হোক ।...

ধ্বংসের পরিকল্পনা

লোকটা প্রতিভাধর বিজ্ঞানী । কিন্তু উন্মাদ বলে মনে হচ্ছিল তাকে । তার হাবভাবে ক্রমশঃ অপকৃতিস্থ মানবের আচরণ ফুটে বেরুচ্ছিল । সে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে চোখ কটমট করে আমাদের দিকে একবার তাকাল । তারপর চলে গেল কফিনটার কাছে । কাচের কফিনটার ঢাকনা খুলে সে ঝুঁকে রইল কিছুক্ষণ । তারপর পাশের একটা প্রকাণ্ড কম্পিউটারের বোর্ডে আটকানো একটা স্পিংয়ের মতো কুণ্ডলীপাকানো তার টেনে কফিনের ভেতর ঢোকাল । পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল না কী সে করছে । একটু পরে সে ঢাকনা খোলা রেখেই অন্য একটি কম্পিউটারের সামনে গেল । পর্দায় লাল-নীল আলোর রেখা জ্বলে উঠছে, নিভে যাচ্ছে । বিচিত্র আঁকবুঁকি ফুটে উঠছে । সে খুব মন দিয়ে সেগুনলো লক্ষ্য করতে থাকল ।

কর্নেলের দিকে তাকালুম । এই বৃদ্ধও কম প্রতিভাধর নন । বহু সাংঘাতিক বিপদের মূখে গুঁর বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যাশাপূর্ণমতিত্ব দেখে অবাক হয়েছি । কিন্তু তাঁকেও এখন অসহায় মনে হচ্ছিল । কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাচ্ছিলুম । মাস্টার ব্রিক কখন থেকে ছবির মতো নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে । তার দুই চোয়াল থেকে বেরুনো শৃঁড় দুটো খাড়া হয়ে রয়েছে ।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা ফিরে এসে চেয়ারে বসল । ঘড়ি দেখে গম্ভীরভাবে বলল—আপনাদের মৃত্যুর ঘড়ি চালু করে দিয়ে এলুম । আর একাত্তর ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট তের সেকেন্ড বাকি ।

কর্নেল শান্তভাবে বললেন—আপনার এ ক্রোনিংয়ের উদ্দেশ্য কী ।

—প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল সৃজনমূলক । এখন ধ্বংসমূলক ।

—আপনি কি কারুর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছেন ?

—অবশ্যই । আমার প্রতিশোধের পরিকল্পনা ত্রিমুখী । বলে সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক শিট কাগজ বের করল । কলম টেনে নিল সন্দৃশ্য কলমদানি থেকে । কাগজে আঁক কেটে বলল—এই দেখুন আমার ধ্বংসের অভিযান কী ভাবে শুরুর হবে ! প্রথম পয়েন্ট হল ডেজার্ট লোকাস্ট—মরু পশুপাল । এদের কোনো পেস্টিসাইডস প্রয়োগ করেও মারা যাবে না । কারণ এদের শরীরে প্রতিরোধ শক্তি প্রচণ্ড । মার্চ-এপ্রিলের প্রথমে এরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের শস্যক্ষেত্রে গিয়ে হানা দেবে । খারিফ শস্য আর ঘরে উঠবে না । দূর্ভিক্ষ দেখা দেবে । সরকারের উদ্ভূত খাদ্য ভান্ডার খালি হয়ে যাবে রিলিফের কাজে ।

তারপর আবার পঙ্গপালের ব্রিডিং এবং আরও শক্তিশালী পঙ্গপাল আগামী শরতকালে পূর্বভারতে গিয়ে হানা দেবে। একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিদেশের কাছে খাদ্যের জন্য হাত পাততে হবে।

নিষ্ঠুর হেসে আবার কাগজে আঁক কেটে বলল—এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট গরুড়পাখির অভিযান। এই পাখির নখের ভেতরে জৈব বিষের থলি রয়েছে। ঠিক একমাস বয়স হলে এ পাখির নখের ভেতরকার বিষের থলিদুটো ফেটে যাবে এবং যৌনকে উড়ে যাবে সে সেদিকেই বিষ ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে। বিষের কণা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেবে এক প্রজাতির সাংঘাতিক ভাইরাস! সেই ভাইরাস ব্যাপক রোগ ছড়াবে—যার কোনো ওষুধ এখনও অনাবিস্কৃত।

এরপর কাগজে একটা গোলা আঁকল বিজ্ঞানী। বলল—এটা ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একজন মানুষ। একজন জীবিত মানুষ থেকে—ওই যে দেখছেন কিফনে শূন্যে আছে—তার দেহকোষ থেকে—তৈরি হবে পৃথক প্রজাতির এক মানুষ, যার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের যত মিল, অমিলও তত। এই কিফনের লোকটা এদেশের একজন ঝানু রাজনীতিক। তাকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি। জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা করে এসে সে তার বাড়ির ছাদের ফুলবাগানে একলা বসে মদ্যপান করছিল। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার।

খিকখিক করে হাসতে লাগল বিজ্ঞানী। কর্নেল বললেন—এই রাজনীতিকের দেহকোষ থেকে কি পৃথক প্রজাতির রাজনীতিক সৃষ্টি করতে চাইছেন?

—ঠিকই ধরেছেন। আপনি বুদ্ধিমান বলেই তো আপনার মৃত্যুর আগে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত মনে করেছি। আমার সৃষ্ট নতুন প্রজাতির রাজনীতিক মানুষ হবে সব স্বাভাবিক রাজনীতিকের এক মূর্তিমান সমবায়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের ধ্বংস স্বরাস্বিত করার জন্যই এমন একজন রাজনীতিওয়ালা দরকার কি না বলুন? আসলে যে প্রজাতির রাজনীতিওয়ালা পৃথিবীতে আগামী যুগে স্বাভাবিক নিয়মে আবিস্কৃত হবে, আমি জেনেটিস্কের ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় তাদের একজন অগ্রগামীকে এখনই সৃষ্টি করতে চাই। কারণ নিউক্লিয়ার যুদ্ধের আগেই পৃথিবী থেকে মানুষের চিহ্ন মুছে যাক—এই আমি চাই।

—মানুষের ওপর এত ক্রোধ কেন আপনার?

একটু স্প করে থাকার পর লোকটা বলল—প্রথমে মানুষের ওপর ক্রোধ ছিল না, ছিল দেশের সরকারের ওপর। পরে ভেবে দেখলুম, মানুষই তো সরকার গড়ে কোথাও প্রকাশ্যে ভোট দিয়ে, কোথাও নীরব সমর্থনে কিংবা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ থেকে। দেশের মানুষের যোগন প্রকৃতি, তাদের সরকারও হয় তেমন প্রকৃতির।

—সরকারের ওপর আপনি ক্রুদ্ধ কেন?

—তাহলে গোড়ার কথাটা বলতে হয় ।

—বলুন । আমার শুনতে ইচ্ছে করছে ।

—আমি ছিলুম প্রতিরক্ষা গবেষণা দফতরের একজন সহকারী বিজ্ঞানী । রাসায়নিক যুদ্ধের প্রতিরোধ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলাম । সে আজ পনের বছর আগের কথা । আমি যার অধীনে কাজ করছিলাম, সেই লোকটার বিজ্ঞানে একটা ডক্টরেট ছিল বটে, আদতে সে ছিল হাড়ে হাড়ে একজন বদ্যরোক্তাট স্বভাবের লোক । অকর্ম্মার ধাড়ী । এক মন্ত্রী আত্মীয়ের জোরে আমার মাথার ওপর বসেছিল । আমি রাসায়নিক যুদ্ধের প্রতিরোধ হিসেবে জেনেটিভ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম । ক্রোনিংতত্ত্বকে বাস্তবে সফল করার কথা ভাবছিলাম । বিভিন্ন প্রতিরোধস্বভাবী ভাইরাসের কোষ থেকে ক্রোনিং করে এক নতুন প্রজাতির ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারলে রাসায়নিক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ তাকে দিয়ে হজম করানো যায় । আপনি নিশ্চয় খবরে পড়েছেন, সমুদ্রের জলে পেট্রল ট্যাংকার থেকে পেট্রল পড়ে জলদূষণ ঘটে এবং সেই পেট্রল নিঃশেষে খেয়ে ফেলে সমুদ্রকে দূষণমুক্ত করবে, এমন একরকম ভাইরাস আমেরিকার এক বাঙালী বিজ্ঞানী সৃষ্টি করেছেন ?

—হ্যাঁ । পড়েছি ।

—ঠিক তেমনি । কিন্তু আমার বস ভদ্রলোক আমার সমগ্র গবেষণা ও ফলাফল নিজের নামে প্রচার করলেন । আমি প্রতিবাদ করায় আমাকে সাসপেন্ড করলেন, তাই নয়—গুদা দিয়ে শাসালেন যে যদি এ নিয়ে আমি হইচই করি, আমার প্রাণ যাবে । আমি জেদী মানুষ । প্রধানমন্ত্রীকে সব লিখে জানাব ঠিক করলাম । কিন্তু কীভাবে খবর পেয়ে শয়তানটা অন্য চক্রান্ত করল । আমি পাকিস্তান সরকারকে নাকি কেমিকেল ওয়ারফেয়ার রেজিস্ট্রার্স প্রজেক্টের মূল্যবান নথি পাচার করে দিয়েছি ! আমি নাকি গুপ্তচর ! বেগতিক দেখে আমি গাঢ়াকা দিলাম । কারণ আমি জানি, এই সাংঘাতিক অপরাধে আমার চরমদণ্ডও হতে পারে !

—কিন্তু আপনি সে অপরাধ করেন নি ।

—না । তারপর আমাকে না পেয়ে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে ধরে নিয়ে গেল । আমাদের ঘরদোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল । তবু আমি ধরা দিলাম না । কারণ আমার গবেষণার চূড়ান্ত সাফল্য বাকি তখনও । তারপর গত পনেরটা বছর ধরে আমি লড়াই করে গেছি বাকি কাজ শেষ করার জন্য । অর্থসংগ্রহ করেছি চম্বলের ডাকাতিদের দলে ভিড়ে । ছদ্মবেশে ছদ্মনামে বিদেশে গেছি । কচ্ছ উপকূলের স্মাগলারদের সাহায্যে বিদেশী যন্ত্রপাতি আনিয়েছি । পতু'গীজ জলদস্যুদের এই গোপন ডেরার কথা আমি নানা সূত্রে জেনেছিলাম । আমার একটা গোপন গবেষণাগারের দরকার ছিল । পেয়ে গেলুম এখানে, তারপর

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—আপনার বাবা-মা কি এখনও বন্দী ?

গলার ভেতর বলল—না । দু'বছর আগে তাঁরা জেলেই মারা গেছেন ।

—আপনার জীবন আশ্চর্য রোমাঞ্চকর । আপনার কৃতিত্বও বিস্ময়কর । কর্নেল প্রশংসা করে বলতে থাকলেন । —বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় আপনার প্রতিভার সাক্ষর দেখতে পাচ্ছি । ওই স্পাইডারশিপও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি !

—আমি ফ্লাইং সসারের অনুকরণে ওটা তৈরি করেছি । খেলায় ডিসকাস থ্রোয়িং নিশ্চয় দেখেছেন । এই গ্যাডিটা ডিসকাসের গড়নে তৈরি । তাই সামান্য স্পিড দিলে স্পিড বহুগুণ বেড়ে যায় । আকাশে, জলে বা স্থলে সমান বেগে ছুটতে পারে ছুঁড়ে মারা ডিসকাসের মতো ।

—কিন্তু এবার আপনি কেন প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করছেন না ? যদি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনার পক্ষ থেকে গিয়ে সব কথা খুলে বলব ।

হাত তুলে বলল—কোনো দরকার নেই । বাবা-মায়ের মৃত্যুর খবর যেদিন কাগজে পড়েছি, সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছি—আমি দেশটাকে ধ্বংস করে দেব । দেশটা গলেপচে গেছে । এর মৃত্যু হওয়া দরকার ।

শ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল । তারপর— আসছি বলে লিফটের কাছে গিয়ে সুইচ টিপে লিফটের দরজা খুলল এবং ভেতরে ঢুকে ফের সুইচ টিপল । লিফটটা বিদ্যুৎগতিতে ওপরে উঠে গেল ।...

ইন্দ্রনীলের আবির্ভাব

মাস্টার ব্লিক একটু আগে থেকে উসখুস করছিল । এতক্ষণে দু'বার ব্লিক ব্লিক করে উঠল । কর্নেল তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—কী হয়েছে মাস্টার ব্লিক ?

পাখিটা হঠাৎ ট্যাঙস ট্যাঙস করে এগিয়ে গেল । তারপর প্রথম কম্পিউটারের কাছে গিয়ে টি ভি পর্দার দিকে তাকিয়ে ফের ব্লিক ব্লিক করতে থাকল । এবার পর্দার দিকে চোখ গেল আমাদের । কর্নেল বললেন—বদুর্ভাগ্য ! মাস্টার ব্লিক তার স্রষ্টাকে পর্দায় দেখতে পেয়েছিল ।

পর্দায় আবছা জঙ্গলের দৃশ্য ফুটে উঠেছে এবং বিজ্ঞানী প্রবরের আঙুলের ডগায় আলো জ্বলছে । সেই আলোতেই রাতের জঙ্গল একটু-একটু আভাসিত হচ্ছে । কোথায় যাচ্ছে সে ? বদুর্ভাগ্যে পারছি, ওপরকার জঙ্গল তথা দ্বীপের দৃশ্য এখানে বসেই দেখা যায় এবং বিজ্ঞানী লোকটা এভাবেই নজর রাখে, কেউ এ দ্বীপে এসে পড়েছে কি না । সে ঢালু পথ ধরে বেলাভূমিতে নামল । তারপর জলের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের ওজর্ননী তুলে কী ইশারা করতে থাকল । একটু পরে জল থেকে ভেসে উঠল সেই হলুদরঙের স্পাইডারশিপ । কর্নেল বললেন—বদুর্ভাগ্যে পারছ জঙ্গল ? বাঁ-হাতের আঙুলে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে । তার সাহায্যে গ্যাডিটা ডেকে আনলেন ভদ্রলোক ।

রাগ করে বললুম—ভদ্রলোক বলবেন না । সিঁহোরার লোকে ওকে দানো বলে । লোকটা সত্যি একটা দানো ।

স্পাইডারশিপে ঢুকে গেল সে। তারপর মন্থতেই গাড়িটা জলমাকড়সার মতো বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হল অন্ধকারে।

হঠাৎ কর্নেল বললেন—আরে। এ আবার কে?

স্ক্রিনে আবছা কালো একটা মূর্তি ফুটে উঠেছে। মূর্তিটা পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে কেল্লাবাড়ির দিকে। একটু পরে ওপরকার ঘরের মেঝেয় তার সিলিন্ডার মূর্তি দেখা গেল। বদ্বলনুম, এই কম্পিউটারাইজড টিভির স্বয়ং চালিত অ্যান্টেনা সবরকম মূর্তিভংগ অবজেক্টকে কেন্দ্র করে ছবি পাঠায়। মূর্তিটা বসে পড়েছে এবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পর্দা থেকে মূর্তিটা মূছে গেল। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর লিফটের স্কেলের কাছে গেলেন। তখন রিক খুঁট খুঁট শব্দে একটা রোবোট কোথেকে এসে কর্নেলের কোট খামচে ধরল যান্ত্রিক হাতে। আমি আঁতকে উঠলুম। মাস্টার রিক এসে রোবোটটার পিঠে জোরে ঠোক্তর মারল। ঠনাক করে শব্দ হল। কর্নেল রোবোটটাকে দেখছিলেন। হাত বাড়িয়ে তার মাথার দিকে আনতেই রোবোটটা অন্য হাতে কর্নেলের হাতটা চেপে ধরল। কর্নেল বললেন—জয়ন্ত! জয়ন্ত! ওর মাথার লাল বোতামটা জোরে টিপে দাও।

দৌড়ে গিয়ে লাল বোতামে চাপ দিলুম। তখন রোবোটের দুটো হাত ঝুলে পড়ল। কর্নেল একটু হেসে বললেন—জাপানী ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোট-গার্ড। টোপিকওর একটা কারখানায় এই প্রহরীরোবট গত বছর দেখে এসেছিলুম। ভাগিাস, কন্ট্রোলসিস্টেমটা জেনে নিয়েছিলুম। কাজে লাগল। যাই হোক, দেখি লিফটটা নামানো যায় নাকি।

বললুম—ওপরে গিয়ে চাবি ঐটে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে গেছে হয়তো।

—দেখা যাক। বলে কর্নেল খুঁটিয়ে স্কেলের ফ্রেমটা লক্ষ্য করতে থাকলেন। এটা-ওটা টেপার্টোপ করেও কোনো কাজ হল না।

তখন কর্নেল বললেন—নিশ্চয় কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে কোথাও। একটা মাদার কন্ট্রোল সিস্টেম না থেকে পারে না। চলো তো, খুঁজে দেখি শিগগির!

খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হলুম দুজনে। মাস্টার রিক নিষ্ক্রিয় রোবোটটার গায়ে ঠোক্তর মারছে, কামড়ে ধরছে। হঠাৎ কর্নেল বললেন—নিশ্চয় সেটা ওর চেয়ারে বা টেবিলের কোথাও থাকা উচিত।

বলে টেবিলের কাছে গেলেন। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে টেবিলের তলায় পায়ের কাছে একটা ছোট্ট বাস্ক পেয়ে গেলেন। বাস্কটার সঙ্গে তার পরানো আছে একগুচ্ছের। টেবিলে রেখে সংকেত চিহ্ন দেখতে দেখতে একটা খুঁদে স্নাইচে চাপ দিলেন। ঘস করে একটা শব্দ হল। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, লিফটটা নেমে এল। কর্নেল বললেন—আপাতত এখনই এখান থেকে বেরুনো দরকার।

লিফটে মাস্টার ব্লিককেও চাপানো হল। রোবোটটা দাঁড়িয়েই রইলো তেমনি। আমরা ওপরে উঠে গেলুম। লিফটের আলোয় দেখলুম সেই মূর্তিটা একজন মানুষের। পরণে শতচ্ছিন্ন পোশাক। ক্লান্ত চেহারা। চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আমাদের দেখে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। কর্নেল তার সামনে গিয়ে বলে উঠলেন—আপনি কি ইন্দুনীল রায়? মাথা নেড়ে একটু হাসবার চেষ্টা করল সে।

—শিগগির আমাদের সঙ্গে আসুন। জয়ন্ত, ঠুঁকে একটু সাহায্য করো। আমাদের এখনই কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার।

তিনজনে অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বেলাভূমিতে নামলুম। এখন দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। আকাশে নক্ষত্র বিকসিত করছে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। বেলাভূমি ধরে আমরা দূরের দিকে হেঁটে চললুম। সেইসময় কর্নেল বলে উঠলেন—ওই যাঃ! সেই টিভিটা বন্ধ করে আসা উচিত ছিল। ওটার স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টেনা আমাদের গতিবিধি দেখিয়ে দেবে।

বললুম—আমরা যদি না নড়াচড়া করে কোথাও বসে থাকি, তাহলে বোধ করি টিভি পর্দায় আমাদের ছবি ফুটে উঠবে না। আমি লক্ষ্য করছি, ওই লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকছিল, তখনই পর্দায় কোনো ছবি উঠছিল না। ম্যাভিং অবজেক্টের ছবিই ওতে ফোটে।

কর্নেল বললেন—শুধু ম্যাভিং অবজেক্ট নয় জয়ন্ত। অবজেক্ট কোনো প্রাণীর হওয়া চাই। মাস্টার ব্লিক, সাবধান! এখনকার মতো নড়বে না। ব্লিক ব্লিক করবে না। কেমন?

মাস্টার ব্লিক বলল—ব্লিক!

—চুপ! কর্নেল থাম্পড় তুলে বললেন।—স্পিকটি নট। তারপর তাকে কোলে তুলে নিলেন।

ডাইনে পাথরের স্তূপ আবছা নজরে আসছিল। আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে ইন্দুনীল বলল—এটা কী পাথি?

কর্নেল বললেন—পৌরাণিক গরুড়পক্ষী। আর কথা নয়। নড়াচড়া নয়। এখানে চুপচাপ বসা যাক।

রহস্যময় নীল কুয়াশাবৃত্ত

মাথার ওপরে রাতের আকাশের নক্ষত্র ঢেকে একটা নীলচে রঙের বিশাল বৃত্ত নেমে আসতে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল! ওটা কী?

কর্নেল দেখে বললেন—মুখ গর্দজে থাকো সবাই। চোখ বন্ধ রাখো। সাবধান!

শনশন শব্দে তীক্ষ্ণ হুইসল। তারপর চারদিক হাংকা নীল আলোয় ভরে

গেল। সেই সঙ্গে শব্দ হল প্রলয় কান্ড। প্রচণ্ড ঝড় আমাদের খান্না মেয়ে নিচের বেলাভূমিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল। হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে ঝুঁকে আমরা বসে রইলাম।

কর্নেল মদুস্বরে বললেন—মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার সিহোরা গ্রামে দেখেছি মানুষের তৈরী যা কিছু জিনিসের ওপরই এই অশুভ ঝড়ের হামলা। পালিত পশুও অবশ্য মারা পড়েছিল দেখেছি। সম্ভবত মানুষের সংসর্গে বাস করে বলে তাদের ওপরও হামলা হয়েছে। কিন্তু তত বেশি ক্ষতি করা যেন এ ঝড়ের উদ্দেশ্য নয়। জয়ন্ত, মহাজাগতিক কোনো বুদ্ধিমান সত্তা যেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই হামলা করছে।

বললাম—আমারও তাই মনে হচ্ছে! কিন্তু বেছে বেছে শব্দ সিহোরা এলাকা। আর রানের এই ঘূঁষে কেন?

ইন্দুনীল বলল—এবার আমার কথা শুনুন। পাজাবের ওপর দিয়ে হ্যাং গ্রাইডারে উড়ে আসতে আসতে হঠাৎ বাতাসের খান্না রাজস্থানের থর মরুভূমির আকাশে চলে গিয়েছিলুম। গ্রাইডারে কন্ট্রোল সিস্টেম ছিল। বাতাসের জোর কমলে আবার দক্ষিণে ঘুরিয়ে দিলুম গ্রাইডার। বেলা পড়ে এসেছিল। একসময় ম্যাপ এবং চার্ট মিলিয়ে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করে দেখি, আমি গুজরাটের দিকে চলেছি। তারপর আবিষ্কার করলাম কন্ট্রোল সিস্টেম অকেজো হয়ে গেছে। কিছুতেই গ্রাইডারের গতিপথ বদলাতে পারলাম না। ব্যাটারি পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। আলো নিভে গেছে। অসহায় হয়ে ভেসে চলেছি আকাশে। যে কোনো মনুষ্যের আশংকা করছি, পাহাড়ে খান্না লেগে গর্গড়া হয়ে যাব। হঠাৎই দেখি গ্রাইডার নেমে চলেছে। ডানা দুটো নব্বই ডিগ্রি বরাবর কাত হয়েছে। পালকের মতো নেমে পড়ল আমার হ্যাং গ্রাইডার। বেগট খুলে নেমে এলাম। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না। কম্পাসও অচল। তাই দিক নির্ণয়ের জন্য আকাশে ধুবতারা খুঁজতে লাগলাম। তারপর অবাক হয়ে দেখি, আমার ওপর—একটু আগে যে নীল কুয়াশাবৃত্ত নেমে এসেছিল, ঠিক তেমনি একটা জিনিস ভেসে আছে। তারপর আমি ভীষণ চমকে গেলুম। বলতে পারেন, আমি একটা গাঁজাখুরি গল্প শোনাচ্ছি। বিশ্বাস করুন, আমার প্রতিটি কথা সত্য।

কর্নেল বললেন—না, না। বলুন আপনি!

—আমি দেখলাম যেন চুম্বকের টানে সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছি। একটুও ওজন নেই শরীরের। মাধ্যাকর্ষণ টের পাচ্ছি না। নীল কুয়াশাবৃত্তটার কাছাকাছি পৌঁছে টের পেলুম ওটা আমাকে যেন বদলত অবস্থায় নিয়ে চলেছে। আঁতকে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল, চোখ খুলে দেখি জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। অন্ধকার হলেও এটা জঙ্গল, তা বদলতে পারছিলাম। টলতে টলতে উঠে দাঁড়লাম। তারপর আশ্রয়ের খোঁজে হাঁটতে থাকলাম। কতবার

আছাড় খেয়ে কাঁটায় পোশাক ছিঁড়ে ফালাফালা হল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল বাতি উঁচুতে জ্বলে উঠে তক্ষুনি নিভে গেল। অনুমান করে সেই-দিকে ওই ভাঙা বাঁড়টায় হাজির হয়েছিলুম। তারপর আপনারা—

কর্নেল বললেন— চুপ।

পশ্চিমের জলাভূমিতে লাল নীল হলুদ আলোর বিন্দু পর্যায়ক্রমে জ্বলতে জ্বলতে কী একটা এগিয়ে আসছিল। সেটা তীরে এসে পৌঁছুলে দেখলুম স্পাইডারশিপ এতক্ষণে ফিরল। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন— বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ফিরে এলেন। ল্যাবরেটরির দশা দেখে আশাকরি রাগের চোটে আরও পাগল হবেন। এস জয়ন্ত, আসুন ইন্দুনীলবাবু! আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখা দরকার। সড়ঙ্গপথ আমরা খুল রেখেছিলুম। কাজেই মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড় ঔঁর ল্যাবরেটরির সব যন্ত্র নিষ্ক্রিয় করে রেখে গেছে।

বেলাভূমির ধারে পাথরেরর আড়ালে আমরা চুপিচুপি এগিয়ে চললুম। স্পাইডারশিপটা মাকড়সার মতো দুর্দিকে ঠ্যাং বের করে তরতরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। সেই হালকা হলুদ আলোয় হলুদরঙের স্পাইডারশিপকে থামতে দেখলুম জঙ্গলের ভেতরে। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন— জয়ন্ত, মাস্টার ব্লিককে ধরো, আশা করি আর তোমাকে ঠোকরাবে না।

শ্রীমান রামগরুড়ের ছানা আমার বুকে সের্টে রইল। কর্নেল পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন। একটু পরে দেখি, উনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ঝোপের আড়ালে গিয়ে ওত পেতে বসলেন। আমরাও একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে বসে আছি। চাঁদের আলোটা আবছা হলেও ওই জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীকে গাছপালার ভেতরে থেকে দৌড়ে বেরতে দেখা গেল। স্পাইডারশিপের কাছে আসতেই কর্নেল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইন্দুনীল অবাক হয়ে বলল—কী ব্যাপার?

কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম—জয়ন্ত! তোমরা এখানে চলে এস।

গিয়ে দেখি কর্নেল লোকটার পিঠে বসে আছেন। মাস্টার ব্লিক ব্লিক ব্লিক করতে করতে আমার কোল থেকে নেমে কর্নেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, ওখানে ওই কালো জিনিসটা পড়ে আছে। সাবধানে তুলে আমাকে দাও। ওঠা লেসার পিস্তল।

মারাত্মক অস্ত্রটা কুড়িয়ে কর্নেলকে দিলাম। তখন কর্নেল ওর পিঠ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—মিঃ এক্স! এবার ভালমানুষের মতো উঠে দাঁড়ান। দুঃখ করে লাভ নেই। যা বলছি, লক্ষ্যমী ছেলের মতো শুনুন!

সে দুহাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরুর করল। কর্নেল তাকে টেনে ওঠালেন! ফের বললেন—মিঃ এক্স। আমাদের সিহোঁবা নিয়ে চলুন।

—আমি মিঃ এক্স নই। সঞ্জন সিং রচপাল।

—মিঃ রচপাল! চলুন আমরা সিহোঁরা বাই। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ স্থালনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সরকার যাতে আপনার বিস্ময়কর গবেষণায় সাহায্য করেন, সে চেষ্টাও আমি করব। দেখলেন তো মিঃ রচপাল, আপনার ধ্বংস পরিপনাকে ব্যর্থ করার জন্য যেন প্রকৃতিই পাণ্ডা ব্যবস্থা রেখেছেন? আপনি প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। আপনি আশাকারি বদ্ব্যভূতে পেরেছেন, ঈশ্বর কি না জানি না—তাকে আমি ঈশ্বরও বলব না—কী এক দুর্জয়ের শক্তি এখনও যেন সারা সৃষ্টিকে নজরে রেখেছে। মহাজাগতিক চৌম্বক প্রবাহ তারই এক প্রহরী হয়তো।

সঞ্জন সিং রচপাল রুমালে চোখ মূছে বললেন—ও কে। এক মিনিট, স্পাইডারশিপের ইউরেনিয়াম জ্বালানি কতটুকু আছে দেখে নিই।

বলে স্পাইডারশিপের ওপরকার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর আমাদের বোকা বানিয়ে চোখের পলকে প্রকাণ্ড চাকতির মতো হলদুদ মাকড়সা গাড়িটা সই করে আকাশে উড়ে গেল।

তারপর ঘটল ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকাশে একটা প্রচণ্ড লাল আগুনের ভাটার মতো ওটা পাক খেতে থাকল। তারপর তীর সাদা আলোর ঝলকানি দেখতে পেলুম। কর্নেল বললেন—সর্বনাশ!

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা ধরে গেল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। তেমনি সোনালী জ্যোৎস্না বৃকে নিয়ে আকাশ নির্বিকার। নক্ষত্র ঝিলমিল করছে। টুকরো চাঁদটাও তেমনি নিঃসন্দেহভাবে ঝুলে আছে। কোথাও রাতপাখি ডাকল।

মাস্টার ব্লিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তিনবার ব্লিক করে ডেকে সে দৌড়নো শব্দ করল জলের দিকে। কর্নেল চোঁচিয়ে তাকে ডাকলেন—মাস্টার ব্লিক! মাস্টার ব্লিক!

হতচ্ছাড়া পাখিটা জ্যোৎস্নাভরা আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।...

উপসংহার

রান এলাকা পাকিস্তানের সীমান্তে। তাই দুর্গম জলাভূমি হলেও কোথাও কোথাও ভারতীয় প্রতিরক্ষা ঘাঁট রয়েছে। দুর্দিন দুর্রাত্রি পরে প্রতিরক্ষা উপকূল বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার দৈবাৎ ওই এলাকায় গিয়ে আমাদের দেখতে পায়। আমরা তিনটি মানুষ তখন ক্ষুৎপীড়িত এবং দুর্বল। হেলিকপ্টারটি আমাদের সিহোঁরা পেঁছে দেয়। গিয়ে দেখি, বুদ্ধিমান পৃথিবীজিৎ সিং সেই পঙ্গপালের আশ্রয়স্থানের ফাটলগুলোকে কংক্রিট দিয়ে সীল করে দিয়েছেন।

শুধু ভাবনা ছিল রামগরুড়ের ছানাটোর জন্য। তার দুপায়ের তলায় মারাত্মক বিষাক্ত ভাইরাসের থলি আছে। রান এলাকায় তার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে কর্নেল ইন্দ্রনীল ও আমাকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছিলেন। কিছুদিন পরে কাগজে খবর বেরুল, রানের একটি দ্বীপে মাস্টার ব্রিককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাকে থর মরুভূমির এক দুর্গম এলাকায় গভীর গর্ত করে পড়তে ফেলা হয়েছে।

আর মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড়ের রহস্যমোচন হয়েছিল আরও দুমাস পরে। ভানুপ্রতাপের কেল্লার ওখানে সেই প্রাচীন শস্ত্রের কাছে খুঁড়ে মাটির তলায় শক্তিশালী চুম্বক পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি আরেকটি চুম্বক পাওয়া যায় সম্জন সিং রচপালের ভূগর্ভস্থ ল্যাবরেটরিতে। সম্জন সিং রচপাল সম্ভবত চুম্বকটি সিহোরার ওই প্রাচীন অবজারভেটরি এলাকায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। দুটি চুম্বককে অজস্র টুকরো করে দেশের বিভিন্ন জায়গার যাদুঘরে রাখা হয়েছে। রাজনীতিক ভদ্রলোককে বাঁচানো যায় নি। তবে তাঁর বয়সও ছিল ৪২ বছর। শুধু ইন্দ্রনীলের ব্যাপারটা বোঝা যায় না। কর্নেলের মতে, মহাজাগতিক কোনো দুর্ভেদ্য শক্তি বেচারীকে নিয়ে একটু কৌতুক করেছিল। এ সেই ডোবার ব্যাঙ আর দুশু ছেলেদের ঢিল ছোঁড়ার গম্পর মতো। ওদের কাছে যা খেলা, ব্যাঙদের কাছে তা প্রাণান্তকর। পৃথিবীর মানুষ তো মহাজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙের চেয়ে অকিঞ্চিৎকর প্রাণী।

সে যাই হোক, মাস্টার ব্রিক অর্থাৎ সেই রামগরুড়ের ছানাটির জন্য এখনও আমার খুব দুঃখ হয়। ওর লাল মাথাটিতে যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকত।...

ধুমগড়ে দিকাচবংশ



গোলকধাড়া

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হাতে নস্যর কোটো। হঠাৎ বলে উঠলেন,—অ্যাঃ! পিচাশ!

হাসি চেপে বললাম,—কথাটা পিচাচ হালদারমশাই!

উত্তেজিত হলোই ঢ্যাঙা গড়নের এই গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও ঢ্যাঙা হয়ে ওঠেন যেন। গোয়েন্দা ডগা তিরতির করে কাঁপে। বললেন,—মশায়! চৌতীরিশ বৎসর পদূলিসে সার্ভিস করছি। অন্ধকারে বনবাদাড়ে শ্মশানেশ্মানে ঘুরছি। কখনও পিচাশ দেখি নাই। কর্নেলস্যার, দেখেছেন নাকি?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা গান্ধা পদুরনো বই পড়ছিলেন। দাঁতের ফাঁকে আটকানো চুরটের নীল ধোঁয়া তাঁর চকচকে টাকের ওপর কুন্ডলী পাকিয়ে থেলা করছিল। খণ্ডসদৃশ সাদা দাড়িতে একটুকরো চুরটের ছাই আটকে ছিল। মৃদু তুলতেই তা খসে পড়ল। বললেন,—কী হালদারমশাই?

—পিচাশ!

—নাহ্। দেখিনি। তবে শুনছি পিচাচ নাকি শ্মশানের আশেপাশে থাকে। মড়া খায়।

ধূমগড়ের পিচাশ ব্যাবাক একটা মড়া খাইয়া ফ্যালাইছে।—হালদারমশাই আবার একটিপ নস্য নিলেন। উত্তেজনার সময় দেশোয়ালি ভাষায় কথা বলাও তাঁর অভ্যাস। বললেন : জয়ন্তবাবুগো পেপার না লিখলে কথা ছিল। ছয় লক্ষ সাকুলেশন। তাই না জয়ন্তবাবু?

বললাম,—আজ রোববারে ছ লাখ। অন্যদিন চার লাখ। কিন্তু দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার ওই খবরটা মোটেও এক্সক্লুসিভ নয়। নিউজ এজেন্সির পাঠানো খবর। কাজেই এ খবরকে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। আসলে পাতা ভরানোর জন্য অনেক সময় বাজে খবরও ঢোকাতে হয়। আবার সাংবাদিকরাও মাঝেমাঝে রাজনীতির কচকাঁচ থেকে পাঠকদের রিলিফ দিতে মজার-মজার খবর তৈরি করেন। বিশেষ করে আজ রোববার ছুটির দিনে পাঠকদের একটু আনন্দ দেওয়া মন্দ কী?

কর্নেল গভীর মূখে বললেন,—জয়ন্তের কথায় কান দেবেন না হালদারমশাই! ধূমগড়ের শ্মশানে সত্যিই পিচাচের ডেরা আছে। পিচাচটা একটা মড়ার পেট চিরে নাড়িভাঁড়িও খেয়েছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যথারীতি 'সাই গিয়া' বলে জোরে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম,—সর্বনাশ! হালদারমশাই সত্যিই ধূমগড়ে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল বললেন,—গেলে একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। তুমিও তাঁর সঙ্গে ধরলে পারতে।

—কী আশ্চর্য ! আপনি এই গাঁজাখুরি খবরে বিশ্বাস করেন ?

—করি বৈকি । বিশ্বপ্রকৃতিতে রহস্যের কোনও শেষ নেই ডার্লিং !

—কর্নেল ! আপনি কী বলছেন ? পিশাচ-টিশাচ মানুষের আদিম বিশ্বাস । কুসংস্কার মাত্র ।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু একটু হেসে বললেন,—তুমি ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত ! ক্রোম্যাগনন মানুষ এবং হোমো সেপিয়েন—সেপিয়েন অর্থাৎ আধুনিক মানুষের মধ্যকার পর্ষায়ে অবস্থা কী ছিল, এখনও বিশেষ জানা যায়নি । তাই মিসিং লিংক কথাটা বলা হয় । কে বলতে পারে পিশাচ সেই মিসিং লিংক নয় ? বিশেষ করে ধুমগড় জায়গাটা আমি দেখেছি । পাহাড় জঙ্গল নদী আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহস্যময় অনেক কিছুই থাকতে পারে । ওখানকার শ্মশানটাও ঐতিহাসিক ।

কর্নেল বইটা টেবিলে রাখলেন । এতক্ষণে চোখে পড়ল, মলাটে সোনালি হরফে লেখা আছে : ‘ধুমগড়ের রাজকাহিনী’ বললাম,—তা হলে বোঝা যাচ্ছে, পিশাচের গল্প এই বইটাতেও আছে ।

কর্নেল হাসলেন,—নাহ্ । এটা ধুমগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কাহিনী । ১৮৯০ সালে রাজাবাহাদুর জন্মজয় সিংহের লেখা পারিবারিক ইতিহাস ।

—ব্যাপারটা সন্দেহজনক কিন্তু ।

—কেন ?

—কাগজে ধুমগড়ে পিশাচের খবর বেরুল, আর বইটাও আপনার হাতে চলে এল ।

ষষ্ঠীচরণ আরেক দফা কফি আনল । কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন,—বইটা আমার হাতে উড়ে আসেনি । গত মাসে ধুমগড় গিয়েছিলাম অর্কিডের খোঁজে । ওইসময় ওখানকার রাজাদের বংশধর রণজয় সিংহের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । কথায়-কথায় বংশের লম্বাচওড়া গল্প শোনালেন । গল্পগুলো যে সত্য, তা প্রমাণের জন্য এই বইটা আমাকে পড়তে দিলেন । আমি উঠেছিলাম নদীর ধারে ফরেস্ট-বাংলোয় । সেখানে বিদ্যুৎ নেই । হেরিকেনের আলোয় বইটা পড়তে শুরু করলাম । সকালে ফেরত দেবার কথা ছিল । হঠাৎ রণজয় সিংহ রাতদুপুরে গিয়ে হাজির । ভেবেছিলাম পারিবারিক ইতিহাসের বইটা নিয়ে কেটে পড়েছি কিনা দেখতে এসেছেন । কিন্তু তা নয় । ভদ্রলোক ছিপছিপি একটা অদ্ভুত কথা বললেন । বইয়ের ভেতর একটা খাঁধা আছে । ওটার জট ছাড়াতে পারলে আমাকে সাধ্যমতো পুরস্কৃত করবেন । খাঁধাটা হল :

পাষাণের পা

কছু ধরিস না

মস্তকে ঘা

কী জলে রে বাবা ॥

কর্নেল কফিতে আবার চুমুক দিলেন। বললাম,—সেকোলে লোকেরা শুনেনি কথায়-কথায় খাঁধা আওড়াতে। কিন্তু এ খাঁধাটা একেবারে গোলকখাঁধা।

আমি হেসে উঠলাম। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন,—কী বললে? কী বললে? গোলকখাঁধা?

—হ্যাঁ। গোলকখাঁধাই বলা চলে।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর টেলিফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল করে সাড়া পেয়ে বললেন,—সঞ্জয়বাবু! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। আপনার জ্যাঠামশাই, ... চলে গেছেন? ... ঠিক আছে। রাখছি।

টেলিফোন রেখে উজ্জ্বল হেসে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। বললেন,—ব্রিলিয়ান্ট, ডার্লিং ব্রিলিয়ান্ট! এ বেলা আমার ঘরে তোমার লাঞ্ছন নেমন্তন্ন।

অবাক হয়ে বললাম—ব্যাপার কী? হঠাৎ আমার এত প্রশংসার কী হল?

একটা জটিল রহস্যের সমাধান তোমার মন্থ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।—বুদ্ধ রহস্যভেদী বাকি কফিটুকু শেষ করে চুরটু ধরালেন। বললেন : আসলে অনেকসময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। অবশ্য তফাত শূন্য একটা ও-কারের। ও-কার জুড়লেই তো সব জল হয়ে গেল।

আরও অবাক হয়ে বললাম,—কী অশুভ!

অশুভ তো বটেই।—কর্নেল গভীর হয়ে বললেন : তবে এবার পিশাচটাকে খুঁজে বের করা দরকার। সেজন্যই ধূমগড়ে ছুটতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে জয়ন্ত, হালদারমশাই পিশাচটার পাল্লায় পড়লে আর জ্যাঠা ফিরে আসতে পারবেন না। কথটা যদি দৈবাৎ কিছুদ্ধগুণ আগে তোমার মন্থ দিয়ে বেরত! ...

ও-কার রহস্য

রাত এগারোটা ভাগ্যদ্রষ্ট্র থেকে নেমে দেখি ছোট্ট স্টেশন। নিরিবিলি স্নানসান চারদিক। আমি ভেবেছিলাম ধূমগড় নাম এবং রাজারাজ্জার রাজধানী ছিল যখন, তখন স্টেশনটা বেশ বড়-সড়ই হবে। কর্নেল আমার মনের খবর কী করে টের পেয়ে বললেন,—আমরা ওল্ড ধূমগড়ে নেমেছি। নিউ ধূমগড় পরের স্টেশন। দ্রুত তিন কিলোমিটার। ওটা বড় স্টেশন।

বললাম,—তা হলে এখানে নামলেন কেন?

আমাদের টিকিট ওল্ড ধূমগড় অর্থাৎ

—কিন্তু এখানে তো লোকজন দোকানপাট দেখছি না। যানবাহনও চোখে পড়ছে না।

সেটাই তো সন্নিবেশ।—বলে কর্নেল পা বাড়ালেন!

গেটে টিকিট নেওয়ারও লোক নেই। স্টেশনঘরের ভেতর স্টেশনমাস্টার একলা বসে টরে টকা করছেন। উদ্দিপরা এক রেলকর্মী প্র্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে

সম্ভবত আকাশের তারা গুঁদাছিল। সে আমাদের কথা শুনতে পেয়ে হনহন করে এগিয়ে এল। ভেবেছিলাম টিকিট চাইবে। কিন্তু সে টিকিট চাইল না। চাপা স্বরে বলল,—এস্তা রাতমে আপলোগ টিশনকে বাহার মাত্‌ যাইয়ে সাব। খতরনাক হো যায়ে গা।

কর্নেল বললেন,—হাম শুন্য ইধার এক পিশাচ নিক্‌লা। সাচ্‌ ?

—সাচ্‌ বাত্‌ সাব! দেখিয়ে না, ইয়ে টিশনমে কোই প্যাসিঞ্জার নেহি উতরা। সব আগলে টিশনমে উতরেগা।

—হামলোগ পিশাচ পাকাড়নে আয়া। ২

—তামাশা মাত্‌ কিজিয়ে সাব। মেরা বাত শুনিয়ে।

কর্নেল মূর্চকি হেসে বললেন,—গভমেন্ট্‌ হামকো পিশাচ পাকাড়নেকে লিয়ে ভেজা। ইয়ে দেখো, ক্যাসে হাম উনকো পাকড়ায়েগা!

কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক বের করে কর্নেল বোতাম টিপলেন। স্টিকের ডগায় সূক্ষ্ম সবুজ রঙের জাল ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ল। রেলকর্মী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেল জাল গুঁটিয়ে স্টিক কিটব্যাগে গুঁজে গেট দিয়ে বেরুলেন।

স্টেশনের পেছনে একটা খাঁ খাঁ চক্কর। তার ওধারে সংকীর্ণ একটা পিচের রাস্তা আঁদ আলো পৌঁছেছে। তারপর গাঢ় অন্ধকার। কর্নেল টর্চ ফেলে বললেন,—তোমার টর্চও রেডি রেখো।

ততক্ষণে আমি টর্চ বের করেছি। বললাম,—কিন্তু এভাবে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—বনবাংলোয়।

—সেটা কতদূরে?

—কাছেই।

অস্বস্তি হচ্ছিল। টর্চের আলোয় দুধারে ঘন জঙ্গল আর বড়-বড় পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছিল। কিছুদূর উৎরাইয়ের পর চড়াই শুরু হল। বারবার পিছনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছিলাম। কলকাতার কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে যে পিশাচের অস্তিত্ব অবাস্তব মনে হয়েছিল, এখানে এখন তা একেবারে বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—টর্চের ব্যাটারি খরচ করো না জয়ন্ত! আমার ধারণা, পিশাচ শ্মশানের কাছাকাছিই আছে। শ্মশান এখান থেকে দূরে।

একখানে পিচরাস্তাটা ছেড়ে খোয়াঢাকা একফালি পথ ধরলেন কর্নেল। পথটা চড়াইয়ে উঠেছে। ওপরে খানিকটা দূরে আলো জ্বগজ্বগ করছিল। এবার দেখলাম, আমরা একটা টিলার ঢাল বেয়ে উঠছি।

একটু পরে সেই আলোটার দিক থেকে কেউ বলে উঠল,—কোন বা?

কর্নেল গলা চড়িয়ে বললেন,—চতুর্দুর্খ নাকি?

জোরালো টর্কের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর দৌড়ে এল একজন খাঁকি প্যান্টশার্ট পরা লোক। তার একহাতে বন্দুক। বদ্বলাম ফরেষ্ট গার্ড। সে স্যালুট ঠুকবে বলল,—কর্নিসাব! আপ?

—হ্যাঁ চতুমুখ। দয়ারাম আছে তো? নাকি পিশাচের ভয়ে বাড়ি পালিয়েছে?

চতুমুখ হাসল,—জি হাঁ কর্নিসাব। তবে আপনার কিছু অসুবিধা হবে না। আমি আছি। মাণিকলালভি আছে।

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম। চতুমুখ লোকটি সাহসী বোঝা গেল। তার মতে, পিশাচের সত্যিমিথ্যা সে জানে না। তবে এমনও হতে পারে, গুজব রটিয়ে চোরা শিকারি বা কাঠ পাচারকারীরা এই মওকায় জঙ্গল লুণ্ঠবে! তাই রেঞ্জারসাবেব তাদের দুজনকে রাত জেগে নজর রাখতে বলেছেন। উঁচু কাঠের টাওয়ারে লঠন জ্বলছে। সেখানে দুই বনরক্ষী বসে রাত কাটায়।

টাওয়ারের দিকে ঘুরে চতুমুখ চোঁচিয়ে বলল,—মাণিকলাল! কলকণ্ডাসে কর্নিসাব আয়া!

সেখান থেকে সাড়া এল,—সেলাম কর্নিসাব!

বাংলোটা কাঠের তৈরি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। লঠনের আলোয় দেখলাম, বেশ ছিমছাম সাজানো গোছানো। জানালাগুলো খুলে দিলে হাওয়া খেলতে লাগল। পেছনে নদীর জলের কলকল ছিলছিল শব্দ। খাওয়া আমরা ট্রেনেই সেরে নিয়েছিলাম। কর্নেল তাঁর প্রিয় পানীয় কফি চিনি, টিনের দুধ এবং কিছু স্ন্যাক্স এনেছেন সঙ্গে। চতুমুখ ঝটপট কিচেনে কেরোসিন কুকার জ্বেলে কফি করে আনল।

পিশাচের গল্পটা চতুমুখ সবিস্তারে শোনাও এবং আগেই বলে দিল, সবই তার শোনা কথা। দিন চারেক আগে রাজবাড়ির একজন বয়স্ক চাকর হঠাৎ খড়্‌খড় করতে করতে মারা পড়ে। তখন রাত প্রায় নটা দশটা। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, হার্টফেল। রাজবাড়ি এখন নামেই। অবস্থা পড়ে এসেছে। দালানকোঠা দিনেদিনে মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়েছে। তো লোকটাকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেছে, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সব কাঠ ভিজ্জে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। তাই দুজনকে বসিয়ে রেখে বাকি লোকেরা শুকনো কঠ আনতে গিয়েছিল। তখন বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু বিজলি চমকচ্ছে। মেঘ ডাকছে। হঠাৎ লোকদুটো নাকি বিজলির ছটায় দেখে, কালো কী একটা জন্তু দুই পায়ে হেঁটে মড়ার খাটিয়ার কাছে এল। মুখের দু'পাশে দুটো বড়বড় দাঁত। বাঁভেঁস মুখ। লোকদুটো পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে লাঠিশোটা বন্দুক বয়স টর্ক নিয়ে অনেক লোক শ্মশানে ছুটে আসে। দেখে, খাটিয়ার মড়া নেই। খঁজতে খঁজতে একটু তফাতে জঙ্গলের ভেতর মড়া পাওয়া যায়। কিন্তু পেটের নাড়িভূঁড়ি সবটাই খুবলে তুলে

সেই দৃশ্যে জন্তুটা খেয়ে ফেলেছে। এবার সবাই ধরে নেয়, জন্তুটা পিশাচ।
মড়াটা অবশ্য দাহ করা হয়।

পরদিন রাতে রাজবাড়ির বড়তরফ রণজয় সিংহের কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে
যায়। জানালার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। টর্চের আলো জ্বালতেই নাকি
পিশাচটাকে দেখতে পান। ভীতু মানুষ। হাত থেকে টর্চ পড়ে যায়। পরে
চেষ্টা চাষ করে। ততক্ষণে পিশাচ উধাও। গদুজব এত বেশি রটেছে যে,
ধুমগড়ের অনেকেই নাকি পিশাচটা দেখেছে। তাই সন্ধ্যার পর বাজার দোকান-
পাট রাস্তাঘাট সুনসান ফাঁকা হয়ে যায়। কেউ নাকি সন্ধ্যার পর পারতপক্ষে
একা বেরোয় না।

ঘটনাটা শুনিয়ে চতুর্মুখ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। তবে সে বলে গেল,
পিশাচ না আসুক, নদী পেরিয়ে জঙ্গল থেকে বাঘ-ভালুক আসতেও পারে।
কাজেই আমরা যেন দরজা ভাল করে এঁটে শাই।

খবরের কাগজে মোটামুটি ওইরকম বিবরণই বেরিয়েছে। তবে রণজয় বাবুর্
জানলায় পিশাচের আবির্ভাবের কথা বেরোয়নি। সন্ধ্যার পর সব নিরিবিলি
হওয়ার কথাও বেরোয়নি।

কর্নেল দরজা এঁটে জানালার ধারে বসে চুরট ধরালেন। বললেন,— শূন্যে
পড়ো জয়ন্ত!

—আপনি কি পিশাচের জন্য রাত জাগবেন নাকি?

—নাহ। ধুমগড়ের রাজকাহিনীর শেষ কয়েকটা পাতা পড়ে নিয়ে ঘুমোব।

—আর পড়ে কী লাভ? আপনি তো বলছিলেন, একটা জটিল রহস্যের
সমাধান হয়ে গেছে।

কর্নেল দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন,—তোমারই সাহায্যে হয়ে গেছে।

গোলকধাঁধা শুনেন?

—একটা ও-কার জুড়েই সব জল হয়ে গেছে।

—প্রজ্ঞা কর্নেল! হেঁয়ালি করবেন না। ও-কারের চোটে মাথা ভেঁ ভেঁ করছে।

গোলকধাঁধার গোলকের একটা ও-কার দরকার ছিল। অর্থাৎ গোলোক।
রাজবাড়ির যে বয়স্ক চাকর হঠাৎ ধড়ফড় করে মারা গেছে, তার নাম ছিল
গোলোক।

—বদ্বলদম। গোলোক থেকে কী করে রহস্য ফাঁস হল?

—রাতবিরেতে হঠাৎ ধড়ফড় করতে করতে মরে গিয়ে গোলোকই রহস্য ফাঁস
করেছে।

—তার মানে?

—ওই শোনো! ফেউ ডাকছে। কাছাকাছি কোথাও বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে।
ঘুমিয়ে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে চুপ করলাম। সত্যিই ফেউ ডাকছে।

ধাঁধার জট ছাড়ল

কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমার ধূম ভাঙলেন। বললেন,—দয়্যারামকে সাহস দিয়ে নিয়ে এলাম। চতুর্মুখ আর মাণিকলাল রাত জেগে ডিউটি করে। ওদের ঘুমোনো দরকার।

দয়্যারাম বাংলায় চৌকিদার। সেও খুব ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে পিশাচকাহিনী শোনাল। সে জনৈক ফোটোগ্রাফার রামবাবুর কথা বলল। রামবাবু নাকি পিশাচটার ফোটো তুলেছেন। রাতে ঠুঁর জানালায় পিশাচটা গিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে রামবাবু ক্যামেরায় ফ্যাশবালবের সাহায্যে ছবি তোলেন।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেলের সঙ্গে বেরোলাম। প্রায় এক কিলোমিটার যাওয়ার পর বসতি এলাকা চোখে পড়ল। বাঁ-দিকে নদী। নদীর ধারে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। টিলার গায়ে একটা কেল্লাও দেখতে পেলাম। কেল্লা আর আন্ত নেই। কেল্লার নীচে দিয়ে কিছট্টা যাওয়ার পর বিশাল প্রাচীন একটা শিবমন্দির দেখলাম। মন্দিরের ওপাশে ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটাই রাজবাড়ি।

গেট ধসে পড়েছে। দুধারে পামগাছের সারি পদ্রনো আভিজাত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখতে পেয়ে রোগা এবং পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে গায়ের রঙ এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। রাজবংশের বড়তরফ রণজয় সিংহ।

রণজয়বাবু বললেন,—আপনি ধূমদিন পরে আসবেন বললেন। তাই চলে এলাম কলকাতা থেকে।

কর্নেল বললেন,—হঠাৎই চলে এলাম। আমার এই তরুণ সাংবাদিকবন্ধু রাজাবাহাদুর জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়াতে সাহায্য করেছে।

রণজয়বাবুর মুখে বিস্ময় এবং আনন্দ ফুটে উঠল,— কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, খুঁজে পাচ্ছি না কর্নেলসাইয়েব! চলুন, ঘরে গিয়ে বসা যাক।

—পরে বসা যাবে। প্রথমে আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন!

বৃহস্পতিবার রাতে গোলোক কি মন্দির চত্বরে মারা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। মন্দির চত্বরে।

আপনার চোখের সামনেই তো ধড়ফড় করতে করতে মারা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। আমি ওকে ভোরে কলকাতায় আমার ভাইপো সঞ্জয়ের কাছে পাঠাব ভেবেছিলাম। তাই ওকে খুঁজছিলাম। ইদানিং প্রায় দেখতাম সন্ধ্যার পর গোলোক মন্দির চত্বরে গিয়ে বসে থাকত। জিজ্ঞেস করলে বলত, মনে সন্ধ্যা নেই বড়বাবু। দেবতার কাছে শান্তি খুঁজছি।

—গোলোক বলত?

—বলত বলেই মন্দিরে খুঁজতে গিয়েছিলাম । যেই গোলোক বলে ডেকেছি, অমনি কেন যেন চমকে উঠল । মন্দির চত্বরের ওপর বাড়ির দোতলার ঘরের আলো পড়ে । সব স্পষ্ট দেখা যায় । ওকে চমকে উঠতে দেখে বললাম, কী হয়েছে রে ? সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ব্দক চেপে ধরে পড়ে গেল । তারপর কাটা পাঠার মতো খড়্‌খড় করতে করতে স্থির হয়ে গেল ।

—ডাক্তার এসে কী বললেন ?

—হাটফেল ।

—রঞ্জয়বাবু ! সত্যিই কি ডাক্তার এসে বললেন হাটফেল ? আমার ধারণা, ডাক্তার বলেছিলেন আত্মহত্যা করেছে গোলোক । পদূলিশের বামেলার ভয়ে আপনি ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন হাটফেলের উল্লেখ করে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে ।

রঞ্জয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন,—হ্যাঁ । গোলোক সাইনায়ড-জাতীয় কিছন্ন খেয়েছিল । কোনও কারণে ইদানিং ওর চালচলনে কেমন যেন অস্থিরতা লক্ষ্য করতাম । গত বছর ওর বউ মারা যায় । ছেলেপুলে ছিল না । কাজেই মানসিক অশান্তিই ওর আত্মহত্যার কারণ ।

—রঞ্জয়বাবু ! আপনারা তো দু'ভাই ?

—আমি আর সঞ্জয়ের বাবা ধনঞ্জয় । ধনঞ্জয় ক্যানসারে মারা যায় ।

—আপনার কাছে আপনার শ্যালক থাকেন বলছিলেন । কী যেন নাম ?

—চন্ডী ।

—চন্ডীবাবু আছেন ?

রঞ্জয়বাবু বাকামদুখে বললেন,—চন্ডী কখন আছে, কখন নেই বলা কঠিন । বাউডুলের স্বভাব । সামান্য যা ভ্রমিজমা আছে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলাম । কিন্তু খায়দায় আর টো-টো করে ঘোরে । বয়সের তো লেখাজোখা নেই । অথচ নাবালক থেকে গেল এখনও । ধর্মের ষাঁড় আর কী !

কর্নেল পা বাড়িয়ে একটু হেসে বললেন,—চলুন তাহলে । ধর্মের ষাঁড়টিকে দেখে আসি ।

—ওকে পাচ্ছেন কোথায় ?

—মন্দিরেই পাব । শিবের বাহন শিব মন্দিরেই থাকা উচিত ।

—মন্দিরে তো ওকে—

চলুন তো !

যে বিশাল মন্দিরটার পাশ দিয়ে এসেছি, এবার রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সেখানে ঢুকলাম । চত্বরে গিয়ে কর্নেল বললেন—গোলোক কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল ?

উঁচু মন্দিরের সিঁড়ির নীচেটা দেখিয়ে দিলেন রঞ্জয়বাবু,—এই সিঁড়ির ধাপেই বসে থাকত গোলোক ।

কর্নেল সিঁড়ির শেষ ধাপে থোলা একটুকরো বারান্দার দিকে আঙুল তুলে বললেন,—ওই তো ধর্মের ঘাঁড়। শিবের বাহন।

কথাটা বলেই সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গেলেন। তারপর সেই ধাঁধাটা আঙড়ালেন :

পাষাণের পা

কভু ধরিস না

মস্তকে ঘা

কী জ্বলে রে বাবা ॥

রণজয়বাবু অবাক হয়ে বললেন,—কী ব্যাপার কর্নেল মায়ের ?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—ঘাঁড়ের মাথা কে ভাঙল রণজয়বাবু ?

রণজয়বাবু উঠে গেলেন,—সে কী। মাথাটা ভাঙা লক্ষ্য করিনি তো !

কর্নেল বললেন,—ধাঁধার জট ছাড়াতে বলছিলেন। ছাড়িয়েছি। কিন্তু কোন লাভ হল না।

রণজয়বাবু চমকে উঠে বললেন,—লাভ হল না ?

না।—কর্নেল মাথা নাড়লেন : পাষাণের পা কভু ধরিস না। এর মানে হচ্ছে, পাষাণ শব্দের পা ধরা হবে না। পা না ধরলে বাকি রইল ঘণ্ড। অর্থাৎ কি না ঘাঁড়। এবার মস্তকে ঘা। তার মানে, ঘাঁড়ের মাথায় ঘা মারতে হবে। ঘা মারলে মাথা ভেঙে যাবে। তারপর বলা হয়েছে, কী জ্বলে রে বাবা ! এই জ্বলে শব্দ বোঝায় জ্বলজ্বল করছে। উজ্জ্বলতা। কিসের এই উজ্জ্বলতা ? হীরের ! মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার জন্য আপনাদের পূর্বপুরুষকে বাদশাহ আকবর যে হীরে উপহার দিয়েছিলেন, সেই হীরে। জন্মেজয় সিংহ বংশধরদের জন্য এই হীরেটা এই ঘাঁড়ের মাথার ভেতরে লুকিয়ে রেখে ধাঁধা তৈরি করেছিলেন। ধুম্রগড়ের রাজকাহিনী বইয়ে বাদশাহের দেওয়া হীরের কথা আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তা ধাঁধায় বলা হয়েছে।

রণজয়বাবু প্রায় আতঁনাদ করলেন—কে ঘাঁড়ের মাথা ভাঙল ?

—গোলোক ভেঙেছিল।

—কিন্তু হীরে কোথায় গেল ?

—গোলোকের পেটে।

—কী সর্বনাশ !

—হ্যাঁ, সর্বনাশ তো বটেই। হীরে সাংঘাতিক বিষ। আপনাকে আসতে দেখে হীরের টুকরোটা গোলোক গিলে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিবিক্রিয়ায় ওর মৃত্যু হয়।

—কিন্তু গিললো কেন হতভাগা ? লুকিয়ে ফেলতে পারত জামা কাপড়ের তলায়।

—বোকা গোলোক কারও হুকুম পালন করেছিল টাকার লোভে। ওকে

বলা হয়েছিল, ধরা পড়ার উপক্রম হলে যেন সে ওটা গিলে ফেলে। গোলোক জানত না হীরে মারাত্মক বিষ।

রঞ্জয়বাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল বললেন—আপাতত এই পর্যন্ত। তবে আশাকরি, আপনাদের বংশের ঐতিহাসিক হীরে উদ্ধার করে দিতে পারব। ..

পিশাচ দর্শন

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললাম—তা হলে কলকাতায় বসে ঠিকই রহস্যের জট ছাড়াতে পেরেছিলেন! কিন্তু পিশাচ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

বোঝা যাবে। আগে সেই রামবাবু ফোটোগ্রাফারের দোকানে যেতে হবে।—বলে কর্নেল রাস্তায় একটা সাইকেল-রিকশ ডাকলেন।

বাজার এলাকায় গিয়ে রামবাবুর দোকানের খোঁজ পাওয়া গেল। দোকানের নাম 'জয় মা কালী স্টুডিও'। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজীতে লেখা সাইনবোর্ড। কর্নেলকে দেখেই বেঁটে নাদুসনদুস চেহারার এক ভদ্রলোক সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন,—কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! কর্নেলসাহেব যে! আসুন। পায়ের ধুলো দিন। এবার কতগুলো প্রজাপতি আর অর্কিডের ছবি তুললেন? গত মাসে তো অনেক তুলেছিলেন।

বুঝলুম রামবাবুর স্টুডিওতে কর্নেল ছবি প্রিন্ট করিয়েছিলেন। কর্নেল ভেতরে ঢুকে বললেন,—ছবি এখনও তুলিনি। তুলব। তবে আগে পিশাচ দর্শন করতে চাই। আপনি নাকি পিশাচের ছবি তুলেছেন?

রামবাবুর মুখে ভয়ের ছবি ফুটে উঠল। চাপা স্বরে বললেন,—ভয়ের ঘটনা কর্নেলসাহেব। তবে আমার পেশার লোকদের এই একটা অভ্যাস আছে। আসলে ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করা ছিল। ফ্ল্যাশ ফিট করা ছিল না।

—তাহলে পিশাচ যেন আপনার কাছে ছবি ওঠাতেই এসেছিল!

রামবাবু হেসে ফেললেন,—তা যা বলেছেন স্যার। ফ্ল্যাশ ফিট করে ছবি তুললাম। তখন জানালার ধার থেকে থপথপ করে চলে গেল। বাগানে ঢুকে পড়ল।

পিশাচটা পাবলিসিটি চাইছে আর কী!—কর্নেল হাসলেন : যাই হোক, কই দেখি পিশাচের ছবি।

রামবাবু জুয়ার টেনে বললেন,—পুলিশ এসে নেগেটিভটা সীজ করেছে। মোট তিরিশখানা প্রিন্ট বেচেছি। দু'খানা প্রিন্ট পুলিশ নিয়েছে। একখানা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই থেকে নেগেটিভ করব। মনে হচ্ছে প্রচুর বিক্রি হবে।

রঙিন ছবিটা দেখে শিউরে উঠলাম। জানলার গরাদের বাইরে একখানা ভয়ঙ্কর মূখ উঁকি মেয়ে আছে। দু'খানা সুচোলো কব্জীত বেরিয়ে আছে। লাল ঠোঁটে চাপচাপ রক্ত। গোরিলা নয়। কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, ক্রোম্যা-

গগনের পরবর্তী কোনও পৰ্ব্বারের নরবানর । বীভৎস ছবি ।

কর্নেল আতস কাচে খুঁটিয়ে দেখে বললেন,—রেখে দিন ।

রামবাবু চাপা স্বরে বললেন,—কদিন আছেন তো ? একটা কপি আপনার জন্য রাখব ।

রাখতে পারেন ।—বলে কর্নেল বেরিয়ে এলেন ।

রাস্তায় গিয়ে বললাম,—হালদারমশায়ের জন্য ভয় হচ্ছে । ঠুকে খুঁজে বের করা উচিত কর্নেল !

কর্নেল বললেন,—চলো ! এবার শ্মশানতলায় যাওয়া যাক । একটু দূর হবে । রিকশ ডাকি ।

কিন্তু কোন রিকশই শ্মশানতলায় যেতে রাজি হল না । শুধু একজন বলল, সে রাস্তার মোড় অন্ধি বাবে । দশ টাকা লাগবে । কর্নেল রাজি হলেন ।

রাজবাড়ি এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তার মোড় এল । রিকশওয়ালা বলল,—ইধার সিধা চলা যাইয়ে ।

এবড়ো খেবড়ো খোয়াটাকা রাস্তার দুধারে জঙ্গল আর টিলা । কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছিলেন । আমার ভয় হচ্ছিল, বিরল প্রজাতির কোনও পাখির পিছনে উধাও হয়ে না যান । গেলে পরে আমাকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই পিশাচটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে । আমার নাড়িভূঁড়ি খেয়ে ফেলতে দেরি করবে না ।

কর্নেল উধাও হলেন না । কিছুক্ষণ পরে আমরা শ্মশানে পৌঁছলাম । চারদিকে ডালপালা ছড়ানো খুরি নামানো আদ্যিকালের বটগাছ । তার ওধারে শরৎকালের ভরা নদী । এখানে-ওখানে চিতার ছাই আর ভাঙা মাটির কলসি পড়ে আছে । একপাশে কয়েকটা পাথরের ঘর মৃদু থুথুড়ে পড়েছে । তার কাছে একটা পাথরের মন্দির । কতকটা বৌদ্ধস্তূপের গড়ন । খানিকটা ফৌকির দেখা যাচ্ছে স্তূপে । ওটাই সম্ভবত দরজা ছিল । মাটিতে বসে গেছে । ঝোপেও ঢাকা পড়েছে । বললাম, কর্নেল ! পিশাচটা ওই স্তূপের ভেতর থাকে না তো ?

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে বটতলায় একটা খুরির কাছে গেলেন । তারপর বললেন, এখানে কোনও সন্ধ্যাসী ধূনি জ্বালিয়েছিল দেখছি । ছাইটা টাটকা । গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়নি, মাটি দেখে নোঝা যাচ্ছে । একটা ছোট্ট ত্রিশূল আর—মড়ার খুঁলি !

কর্নেল খুঁলিটা কুড়িয়ে নিয়েই ফেলে দিলেন । ঠকাস করে শব্দ হল । হাসতে হাসতে বললেন, প্লাস্টিকে তৈরি নকল খুঁলি । কাজেই হালদারমশাই ছদ্মবেশী সাধু সেজে এখানে ধূনি জ্বেলিয়েছিলেন, এতে আমি নিঃসন্দেহ ।

বললাম,—উনি গেলেন কোথায় ?

কর্নেল মাটিতে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে থমকে দাঁড়ালেন । কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন,—একটুকরো জটা ! মেড ইন চিৎপদুর । পাটের

তৈরি জটা ! জয়ন্ত, হালদারমশাইয়ের নকল জটা ছিঁড়ে পড়ার একটাই অর্থ হয়। ঠুঁকে কেউ আক্রমণ করেছিল।

—সর্বনাশ ! তাহলে পিণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক। কিন্তু ঠুঁর কাছে তো রিভলবার থাকে।

কর্নেল স্তূপটার কাছে এগিয়ে গেলেন। পিঠের কিটব্যাগ থেকে টর্চ বের করে সেই ফোকরের কাছে গদাঁড়ি মেরে বসলেন। টর্চ জ্বললে ভেতরটা দেখেই বলে উঠলেন,—জয়ন্ত ! দেখে যাও !

দৌড়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, খটখটে পাথুরে মেঝের চামচিকের নাদির ওপর চিং হয়ে শুয়ে আছেন আমাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভ। হাত এবং পা বাঁধা। মুখে টেপ সাঁটা ছিল। খুলে গেছে। তার চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার, টর্চের আলোয় চামচিকের ঝাঁক ছত্রভঙ্গ হয়ে ওড়াউড়ি করছে। হালদারমশাইয়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। কিন্তু ঠুঁর সাড়া নেই। অজ্ঞান হয়ে আছেন নাকি ?

কর্নেল ডাকলেন,—হালদারমশাই ! হালদারমশাই !

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পিটপিট করে তাকালেন। বললেন,—জ্বালাতন ! তোরা আমারে ম্যারস্ ক্যান ! যা ! যা ! আবার মারে ! চামচিক্যা কি আর সাথে কয় ?

—হালদারমশাই ! হালদারমশাই !

অঁয়া ?—হালদারমশাই মাথা ঘোরালেন : হালার পিচাশ ? আবার আইছ ? একখান দাঁত উপড়্যা ফ্যালাইছি। আরেক খান রাখ্‌ম না ! কাম অন !

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত ! এই ছদ্মের নিয়ে ভেতরে ঢোকো। বাঁধন খুলে ঠুঁকে বের করে আনো। আমার এই প্রকান্ড শরীর ভেতরে ঢোকানো যাবে না।

আঁতকে উঠে বললাম,—বস্তু চামচিকে যে !

—দাঁর কোরো না। চামচিকের চাঁটিতে মাথা খুলে যাবে। ঢোকো।

চোখ বঁজ্জে ঢুক পড়লাম। চামচিকের ঝাঁকের চাঁটির পর চাঁটি খেতে খেতে বাঁধন কেটে গোয়েন্দাকে টেনে বের করলাম। তখনও উনি গর্জাচ্ছেন ! শাসাচ্ছেন ‘পিচাশের’ ঝাঁক দাঁতটা উপড়ে দেবেন বলে। আধখানা নকল দাঁড়ি মুখের পাশে ঝুলছে। জটার খানিকটা আটকে আছে। পরনে লাল খাটো লুঙ্গি। গলায় রত্নাক্ষের মালা ছিঁড়ে ঝুলছে। গোর্ফের কোণায় সেলোটেকপও ঝুলছে। বাইরে বেরিয়ে ওঁর হৃৎক হল। চোখ মুছে বললেন,—হালার পিচাশটা গেল কই ?

কর্নেল বললেন,—নদীর জলে মুখ কাঁধ রগড়ে ধুয়ে নিন হালদারমশাই !

হালদারমশাই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঝিকঝিক করে হেসে বললেন,—কর্নেলস্যার ! জয়ন্তবাবু ! আপনারা আইয়া পড়ছেন ? পিচাশটায়ে আমি জন্দ করছি ! একখান দাঁত—

—নদীতে চলুন হালদারমশাই ! গোর্ফের পাশে টেপ ঝুলছে। জল না দিলে আটকে থাকবে।

কর্নেল ঠুঁকে টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন !...

হীরের খোঁজে

হালদারমশাইয়ের মদখে জানা গেল, কলকাতা থেকে এসে তিনি নিউ খুমগড়ে একটা হোটেলে উঠেছিলেন। তারপর কাল রাত নটায় শ্মশানতলায় এসে ধুনি জ্বলে সাধু সেজে বসেন। শেষ রাতে ঘুমের ঢুলুনি চেপেছিল। হঠাৎ পেছন থেকে ‘পিচাশটা’ ঠুঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কিন্তু ‘পিচাশের’ গায়ে জোর বলেও নয়, বেকায়দায় পড়ে হালদারমশাই বন্দী হন। তাঁকে টানতে টানতে স্তূপের ভেতর ঢোকায় ‘হালার পিচাশ’। মদখে টেপ সের্টে দিয়েছে। চেষ্টানোরও জো ছিল না।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! এই অবস্থায় হালদারমশাই হোটেলে ফিরতে গেলে পাগল ভেবে লোক জমে যাবে। এখান থেকে সোজা নাকবরাবর হেঁটে গেলে ফরেস্টবাংলো দেখতে পাবে। ঠুঁকে নিয়ে গিয়ে তোমার একপ্রস্ত পোশাক পরতে দাও। ঠুঁর কিছু খাওয়াদাওয়াও দরকার। দেঁরি করো না। আমি অন্যদিকে যাচ্ছি।

হালদারমশাই হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন,—আমার রিভলভার গেল কৈ? আসনের তলায় রাখছিলাম।

‘মেড ইন চিৎপদু’ নকল বাঘছালের আসনটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কর্নেল বললেন,—পিচাচ আপনার রিভলভারের লোড ছাড়তে পারেনি।

হালদারমশাই চিন্তিতমুখে বললেন,—ফায়ার আর্মস পিচাশের কোন কামে লাগব?

কর্নেল আর কোনও কথা না বলে চলে গেলেন। এর পর হালদারমশাইকে নিয়ে আমি কিভাবে যে বাংলোয় পৌঁছলাম কহতব্য নয়। সারা পথ বুক টিপটিপ করছিলাম। এই বন্ধু পিচাচটা ঝোপের আড়াল থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চৌকিদার দয়্যারাম হাঁ করে তাকিয়ে গোয়েন্দা ভঙ্গলোককে দেখছিলেন। বললাম,—শিগগির ঠুঁকে কিছু খাইয়ে দাও, দয়্যারাম। হালদারমশাই আপনি বরং স্নান করে নিন। ওই দেখুন কুয়ো আছে!

দয়্যারামের কাছে জানা গেল, কুয়োটা আসলে এই টিলার মাথায় একটা প্রস্তবণ। ওটা ছিল বলেই বনদফতর এখানে বাংলো তৈরি করেছিল।

স্নান করে আমার পাজ্জাবি-পাজ্জামা পরে হালদারমশাই শব্দে শব্দে দখানা টোশ আর এক কাপ কফি খেলেন। তারপর আমার বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকলেন।

কর্নেল এলেন বেলা দুটো নাগাদ। হালদারমশাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন,—আপনার রিভলভারটা উদ্ধার করেছি। এই নিন। উনি কিটব্যাগ থেকে রিভলভার বার করে দিলেন।

অবাক হয়ে বললাম,—কোথায় পেলেন ওটা ?

—পিশাচের ডেরায় । সিন্ধেটিক বাঘছালে মোড়া ছিল । বাঘছালটা একই অবস্থায় রেখেছি ।

—জানগাটা আপনি খুঁজে বের করেছেন ?

—হ্যাঁ । পশুপাখি কীটপতঙ্গ সব প্রাণীরই ডেরা থাকে । কাজেই পিশাচেরও একটা ডেরা থাকা উচিত । যাই হোক, এখন আর কোনও কথা নয় । হীরে উদ্ধার বাকি আছে । লাক্ষ্যে একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরদুব ।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা বেরোলাম বাংলা থেকে ! কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই ! একটা কথা । দৈবাৎ যদি আমরা পিশাচটাকে জঙ্গলে দেখতে পাই, সাবধান ! যেন গুলি ছুঁড়বেন না । তবে রিভলবার বের করে ওকে ভয় দেখাতে পারেন ! কিন্তু কখনো গুলি ছুঁড়ে বসবেন না । পিশাচটাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় ধরতে চাই ।

অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল ।

কর্নেল বনবাদাড় ভেঙে হাঁটছিলেন । মাঝে মাঝে পাথরে উঠে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন । বললাম,—কর্নেল ! আপনি কি পিশাচের ডেরায় যাচ্ছেন ?

কর্নেল বললেন,—নাহ্, মশানতলায় ।

—মশানতলায় কেন ?

কর্নেল হাসলেন,—আপত্তি আছে তোমার ? আমাদের সবাইকে তো একদিন মশানে যেতেই হবে । কী বলেন হালদারমশাই ?

হালদারমশাই গম্ভীরমুখে বললেন,—হঃ !

বললাম,—জানগাটা অস্বস্তিকর । মড়াপোড়ানো ছাইয়ের গাদা । বিশেষ করে চিতার ছাই দেখলেই আমার গা ছমছম করে ।

কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন,—কী বললে ? কী বললে ? চিতার ছাই ?

—হ্যাঁ । কিন্তু এতে চমকে ওঠার কী আছে ?

কর্নেল হতদস্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন । হকচকিয়ে গিয়েছিলাম । হালদারমশাই লম্বা পা ফেলে ঝুঁকে অনুসরণ করলেন । পিছিয়ে পড়ার ভয়ে আমিও প্রায় জগিং শুরুর করলাম ।

মশানতলায় পৌঁছে কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই, দেখুন তো ! এলোমেলোভাবে অনেক চিতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে । এগুলোর মধ্যে টাটকা চিতা কোনটা হতে পারে ? যতদূর জানি, বৃহস্পতিবার রাতে গোলোকের মড়া পোড়ানোর পর পিশাচের ভয়ে এ মশানে আর কোনও মড়া পোড়ানো হয়নি । নিউ ধুমগড়ের নতুন মশানে সবাই মড়া পোড়াচ্ছে ।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক ঘোরাঘুরি করে দেখতে দেখতে বললেন,—বৃষ্টিবাদলার সবগুলি হেভি ধুইয়া গেছে । তবে আপনি কার চিতা কইলেন য্যান ?

—রাজবাড়ির স্যারভ্যান্ট গোলোকের। মানে যার মড়ার নাড়িভুড়ি খেলে ফেলেছিল পিশাচ।

—তবে তো ওনার চিতার ছাই হেঁড়ি হইব। বলে হালদারমশাই লক্ষ দিয়ে এগোলেন।

—ল্যান্ট বানিং কর্নেল স্যার! হেঁড়ি আশ! এই যে।

কর্নেল গিয়ে বৃষ্টির জল থিকথিকে পাকের মতো ছাইগুলো ঘাটতে শব্দ করলেন। বললাম,—ও কী করছেন?

কর্নেল আওড়ালেন,—যেখানে দেখিবে ছাই / উড়াইয়া দেখ তাই / পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

হালদারমশাইও হাত লাগাতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁকে নিষেধ করলেন! একটু পরে ছাইগাদার তলা থেকে কী একটা জিনিস কুড়িয়ে কর্নেল নদীর ধারে দৌড়ে গেলেন। জলে সেটা ধুয়ে পকেটে ঢুকিয়ে হাসলেন,—জয়ন্ত! *মশান-তলায় আসছিলাম পিশাচটার জন্য ওত পাততে। কারণটা পরে বলছি। তবে এবারও তুমি রহস্যের দ্বিতীয় পর্ব ফাঁস করেছ! ধন্যবাদ ডার্লিং! অসংখ্য ধন্যবাদ! হীরে উদ্ধার হয়ে গেল।

—বলেন কী! ওই জিনিসটা হীরে? গোলোকের চিতার ছাইয়ে কে লুকিয়ে রেখেছিল?

—কেউ না। হীরেটা গিলে গোলোক মারা পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাকস্থলীতে হীরে পৌঁছানোর কথা নয়। গলার নলীতেই আটকে যাওয়া উচিত। কারণ হীরে খাঁজকাটা ধাতু।

হালদারমশাই বললেন, কই দেখি!

—পরে দেখাব। এবার পিশাচের জন্য ওত পাততে হবে। বটগাছের আড়ালে চলুন।

বটগাছের ঝুরির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গর্দভের আড়ালে তিনজনে বসে পড়লাম। সামনে কোপজঙ্গলে ঢাকা ঢালু মাটি নদীতে নেমেছে। এখানে-ওখানে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। হঠাৎ দমকা বাতাসে উৎকট গন্ধ ভেসে এল। নাক ঢাকলাম। চাপা স্বরে বললাম,—এ কিসের দুর্গন্ধ?

কর্নেল ইশারায় চুপ করতে বললেন। বেলা পড়ে এসেছে। পাখিরা তুমুল হুন্না জুড়েছে। সামনে একটা পাথরের আড়ালে একটা শেয়াল এসে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রায় জাম্বব গলায় কার গর্জন শোনা গেল,—যাঁ! যাঁ! যাঁ! যাঁ!

হালদারমশাই উত্তেজনায় ফিসফিস করে বললেন, পিচাশ! পিচাশ!

এবার পিশাচের শরীরের খানিকটা দেখতে পেলাম। কালো লোমশ শরীর। মূখ এদিকে ঘোরাতেই শিউরে উঠলাম। একটা কষদাঁত সন্মুখের দিকে বেরিয়ে আছে। অন্যটা হালদারমশাই ভেঙে দিয়েছেন বলছিলেন।

ভাঁটার মতো চোখ । ভয়ঙ্কর মূখ । পাথরটার পাশে সে বসে পড়ল । তারপর বদ্বালাম, সে খতাজাতীয় কিছুর দিকে মাটি কোপাচ্ছে । দূর্গন্ধটা বাড়ছে ।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন,— তিনজন তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলো ।

আগে হালদারমশাই, তারপরে কর্নেল, শেষে আমি গিয়ে পিশাচটাকে ঘিরে ধরলাম । কর্নেল এবং হালদারমশাইয়ের হাতে রিভলভার । পিশাচটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল । অবাক হয়ে দেখলাম, সে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল ।

পিশাচটা গর্জন করতেই কর্নেল বললেন,—এক পা নড়লেই খুঁলি ফুটো হয়ে যাবে ।

পিশাচটা নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগেই হালদারমশাই এক লাফে তার সামনে গেলেন,—হালার পিচাশ ! ঘুমু দেখছ, ফান্দ দেখ নাই !

কর্নেল গিয়ে পিশাচের মূখে চাটি মারার মতো বাঁহাত ঢালালেন এবং হতভম্ব হয়ে গেলাম । এ যে দেখছি পিশাচের মূখোশপরা একটা লোক ।

কর্নেল বললেন,—চণ্ডীবাবু ! গোলোকের পাকস্থলীতে খাঁজকাটা হীরে পৌঁছানোর কথা নয় । কাজেই ওর নাড়িভূঁড়ি কেটে তুলে এনে এখানে পড়তে রোজ একবার করে তা কাটাকুটি করে হীরে হাতড়ানোর মানে হয় না । খামোকা রোজ ওই পচা দূর্গন্ধ জিনিসগুলো ঘাঁটা পণ্ডিত্রম ।

হালদারমশাই একটানে কালো লোমশ আবরণ খুলে রণজয়বাবুর শ্যালক চণ্ডীবাবুকে বের করলেন । চকাস করে একটা ছুঁরিও পড়ল । হালদারমশাই বললেন,—চিৎপন্থে কিনাছিল । তবে ছুঁরিখান রিয়্যাল ছুঁরি । শৃগালটা গেল কৈ ? পচা নাড়িভূঁড়িগুলো শৃগালের প্রাপ্য ।

কর্নেল চণ্ডীবাবুর জামার কলার খামচে ধরে বললেন,—চলুন চণ্ডীবাবু ! এবার অন্য শ্বশুরালয়ে আপনার থাকার ব্যবস্থা হবে ।

চণ্ডীবাবু হাঁউমাউ করে কেঁদে বললেন,—মাইরি, মা কালীর দিবি স্যার ! আমি হীরে চুরি করিনি ।

- না, না । হীরে নিজের হাতে চুরি করেন নি । খাঁড়ের মাথা ভাঙার ঝুঁকি নিতে চান নি । গোলোকের হাত দিয়ে কাজটা সারতে চেয়েছিলেন । আপনি ধর্মব্রত চণ্ডীবাবু ! আপনার বর্দ্বাক্ষর প্রশংসা করা উচিত । জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়িয়েছিলেন আপনি । তারপর অনন্য আপনার পরিচালনা । গোলোক হাতেনাতে ধরা পড়লে পাছে আপনার কারচুপি ফাঁস করে দেয়, তাই আপনি ওকে হীরেটা গিলে ফেলতে বলেছিলেন । তারপর পিশাচ সেজে শ্মশানে ভয় দেখিয়ে লোকগুলোকে তাড়িয়ে গোলোকের নাড়িভূঁড়ি কেটে এনে এখানে পড়তেছিলেন । পিশাচ যে সত্যিই গোলোকের নাড়িভূঁড়ি খেয়েছে এবং বিশেষ করে সত্যিই এখানে পিশাচের আবির্ভাব ঘটেছে, তা এস্টারিশ করার জন্য শ্রদ্ধা রণজয়বাবুর জানালায় নয়, ফোটোগ্রাফার রামবাবুর জানালাতেও হাজির হয়েছিলেন । আপনি জানতেন, রামবাবু ফোটো না তুলে

ছাড়বেন না তাই অতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতে আপনার পাবলিসিটি হবে। তবে রামবাবুর কাছে আপনার পিশাচমূর্তির ফোটো আতসকাঁচে খুঁটিয়ে দেখেই বদ্বোধিলাম, এটা মদুখোস মাত্র! তারপর এখানে এসে দর্গস্থ টের পেয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে কর্নেল আসামিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার একটা পদূলিসের জিপ আসতে দেখা গেল এবড়োখেবড়ো রাস্তায়। জিপ এসে থামল। একদঙ্গল পদূলিস বেরিয়ে পড়ল। একজন অফিসার সহাস্যে বললেন—তাহলে আমরা আসার আগেই পিশাচ ধরে ফেললেন কর্নেলসায়ের! শেষ দৃশ্য দেখার সন্ধান দিলেন না।

কর্নেল আসামিকে কনস্টেবলদের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন,—বেলা থাকতে থাকতে পিশাচ এসে মাটি খুঁড়বে জানতাম না। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যা না হলে আসবে না। কিন্তু ওর তর সইছিল না। আপনারা থানায় চলুন। আমার রাজবাড়ি হয়ে থানায় যাব।

পদূলিসের গাড়ি চলে গেল।

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কর্নেলস্যার! হালপিচাশের ডেরা—হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস?

কর্নেল হাসলেন,—রাজবাড়িতেই রাজবাড়ির শ্যালকের ডেরা থাকা কি স্বাভাবিক নয়? রণজয়বাবুর কাছে ঔঁর শ্যালকের ঘরের চাবি ছিল না। আমার কাছে সবসময় মাস্টার কী থাকে। তাই দিয়ে খুললাম। আপনার বাঘছালে মোড়া রিভলবার পেলাম। কয়েকটা চিঠি পেলাম। কলকাতার এক জুয়েলার কোম্পানি হীরে কিনতে চেয়েছিল। তাদের গতকাল এখানে পৌঁছানোর কথা। নিউ ধুমগড়ে হোটেল প্যারাডাইসে তারা অপেক্ষা করবে। দুপদুরে সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলাম। তাদের সঙ্গে চান্ডীবাবু লাঞ্চ খাচ্ছিল ডাইনিং হলে। সেখান থেকে ভার্গিস বাড়ি ফেরেন। তাহলে ঘরে ঢুকে সব টের পেয়ে সাবধান হয়ে যেত। যাক্ গে। রণজয়বাবু অপেক্ষা করছেন। হীরেটা তার হাতে পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন,—হীরেখানা একবার দ্যাখাইবেন না কর্নেলস্যার?

কর্নেল কপট গাভীর্ষে বললেন,—চোখ জ্বলে যাবে। ধুমগড়ের রাজকাহিনীর ধাঁধায় বলা আছে :

পাষণ্ডের পা

কভু ধরিস না

বস্তুরে যা

কী জ্বলে রে বাবা ॥

হালদারমশাই আনমনে বললেন,—হঃ! বদ্বাছি।

কী বদ্বলেন তা অবশ্য বললেন না।